ব্যাবিলন কথকতা

১২তম সংখ্যা

১৩ ডিসেম্বর ২০১৭

ব্যাবিলন গ্রুপ

TRENDZ

ডিসেম্বর ১৩, ২০১৭

সম্পাদক
এসএম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি

বিশেষ সহযোগিতা
আরিফ হোসেন

প্রচ্ছদ
মাহবুব শিপু

অলংকরণ
সুব্রত সরকার রাজিব
আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
রাবেয়া খাতুন (ইতি)

সার্বিক শিল্প নির্দেশনা
এসএম এমদাদুল ইসলাম
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি

সহযোগিতা
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৯৩৬১৫৬১০০

BABYLON

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী		৪
সম্পাদকীয়		৬
ব্যাবিলন এবং আমি	মুহাম্মদ সাইফুল হক	৯
কে জানত যে সত্যিই দেখা হবে	এসএম এমদাদুল ইসলাম	১২
মমতাময়ী মা	মোহাম্মদ ইমাম হোসেন	২০
বনফুল	মৌসুমী আক্তার	২৩
সন্ধিলগ্ন	আন্না হাসান	২৫
পায়রা নদী	মোঃ রিয়াজ হোসাইন	২৬
বাসন্তী রঙের স্বপ্ন	খান সাজ্জাদ আল সাইখ	২৭
একজন সাদাকালো মানুষ ও কিছু রঙিন স্বপ্ন	আরিফ হোসেন	৩২
পাবনা মানসিক হাসপাতালে একদিন	উম্মে সালমা ডালিয়া	৩৯
আরশীনগর ঘাট, কাজলার বাঁক গ্রাম-গুবড়া, জেলা-নড়াইল	আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ	৪২
ইভটিজিং	লাইছুর রহমান	৪৪
কল্পনার রাজকন্যা	মোঃ রাকিবুল হাসান মিয়া	৪৫
মানুষ মানুষের জন্য	একেএম গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী	৪৬
পঞ্চপাণ্ডব	কাজী এ এম তুষার আলম	৫০
সুদূর আমেরিকায়	সুলতান উদ্দিন আহমেদ	৫৯
নীলাদ্রি	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	৬৩
চিড়িয়াখানা	আল-মারুফী রহমান (স্বজন)	৭০
জ্যোৎস্নারা উঁকি দেয়	মোঃ কবির হোসেন	৭২
অদৃশ্য অনুরাগ	মেহেদী হাসান	৭৩
এ এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য	আব্দুল কাদির হোসেন	৭৮
ফেইসবুক	এম এম তোফাজ্জল হোসেন	৮৪

বিভীষিকাময় একটি রাতের কাহিনী	প্রদীপ কুমার দত্ত	৮৭
গেরিলা	ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হক	৯১
বর্ষায় আমিয়াখুম	শাহরিনা কবির এশা	৯২
খোলা চিঠি	জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা	৯৯
চকি	মোঃ জোবায়দুল ইসলাম	১০২
স্বপ্নকন্যা	ফরহাদ হোসেন নির্জন	১০৬
Corporate Management- The Japanese Way	Mohammad Hasan	১০৮
How To Be A Good Boss	Liakat Hossain Nayan	১১৪
Photo Album		১১৭-১২০

শুভেচ্ছা বাণী

'ব্যাবিলন কথকতা' এর ১১তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে আমি একটু অবাক-ই হয়েছি। কোনো পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের লেখালেখির প্রতি এত স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ যে তাতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেন– তা এই অনুষ্ঠানে না এলে আমি উপলব্ধি করতে পারতাম না। আমাদের দেশের তৈরি পোশাক কারখানা সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক ধারণা আছে। কিন্তু এখানে এসে আমি প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেছি যে, তার ঠিক উল্টো চিত্রও কিছু কারখানায় আছে এবং ব্যাবিলন তার অগ্রদূত।

ব্যাবিলন গ্রুপের সাথে আমার পরিচয় ব্যাবিলন গ্রুপের একজন পরিচালক ও ব্যাবিলন কথকতার সম্পাদক জনাব এসএম এমদাদুল ইসলামের মাধ্যমে যিনি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির একজন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ এবং উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে তার আন্তরিক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। জনাব এসএম এমদাদুল ইসলাম নিজেও একজন শিল্পী-ফটোগ্রাফার। ফেইসবুকে দেওয়া তার অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন ও সৃষ্টিশীল ছবি দেখে আমি তো বটেই অন্যান্য যারা দেখেছেন, তারাও চমৎকৃত হয়েছেন।

বর্তমানে অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) তহবিল খরচ করে ঢাকা শহরের সৌন্দর্য বর্ধন ও প্রচারণায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাবিলন গ্রুপ একটি ব্যতিক্রম। তাদের সিএসআর তহবিল ব্যয় করা হয় শ্রমিক ও জনকল্যাণমুখী নানা কর্মকাণ্ডে। প্রতিবছর ব্যাবিলন গ্রুপ শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তানদের মেধাবিকাশ ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষাবৃত্তি, শ্রমিকদের আর্থিক জীবনমানের টেকসই উন্নয়নের জন্য গবাদিপশু বিতরণ, দেশের সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বৃত্তি প্রদান, উত্তরায় একটি এতিমখানায় অসহায় ও প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রতিবছর শীতবস্ত্র বিতরণ, নিজস্ব মেডিক্যাল ক্লিনিকের মাধ্যমে শ্রমিক এবং স্থানীয় লোকদের স্বল্পমূল্যে সেবাদান, ফ্রি হেলথ ক্যাম্প, আই (চক্ষু) ক্যাম্প, রক্তদান কর্মসূচী ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করছে।

তাছাড়া, ব্যাবিলন গ্রুপ নারী শ্রমিক ও স্থানীয় নারীদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে নিজস্ব কোম্পানিতে উৎপাদিত স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করছে। নিঃসন্দেহে এই কার্যক্রমগুলো প্রশংসার দাবিদার। সৃষ্টিশীলতার বিকাশে ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের কার্যক্রম ও ক্লাবের সদস্যদের ফটো প্রদর্শনী তাদের সৃজনশীল মননে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ব্যাবিলন কথকতা শুধুমাত্র একটি বার্ষিক ম্যাগাজিন-ই নয়, এটি ব্যাবিলনের শত শত শ্রমিকদের জীবনগাঁথা, তাদের আনন্দ ও উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একটি সুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় দেয়। তারা লিখেছেন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও স্মৃতিকথা। তাদের লেখনির ভাষা প্রাঞ্জল ও তা তাদের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এবং শব্দে শব্দে তাদের জীবনকথার গাঁথুনি অত্যন্ত মাধুর্যময়।

ব্যাবিলন কথকতার প্রকাশনা উৎসবও আমাকে মুগ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানে ব্যাবিলন গ্রুপের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাবলীল অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে করেছে প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর। কেবল শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সৃজনশীলতাও যে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে জরুরি ভূমিকা পালন করে এই সত্যটি ব্যাবিলনকে দেখলে বুঝা যায়। এটি ব্যাবিলন গ্রুপের একটি বিশেষত্ব যা দেশের অন্যান্য পোশাক কারখানাগুলোর জন্য একটি আদর্শ উদাহরণ।

আমি ব্যাবিলন কথকতার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। ব্যাবিলন গ্রুপ তাদের এই সফল মহৎ উদ্যোগকে আরো সম্প্রসারিত করবে– এই প্রত্যাশা রইল।

ব্যাবিলন পরিবারের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আবদুর রব

অধ্যাপক ড. আবদুর রব
প্রাক্তন উপাচার্য, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি
বর্তমান উপাচার্য
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি

সম্পাদকীয়

'ব্যাবিলন কথকতা'-র বারোতম সংখ্যা এটা। আরেকটা মাইলফলক। দ্রুত ধাবমান আরেকটি বছর শেষ হয়ে এল। ব্যাবিলন কথকতা প্রকাশনাটা এখন যেন বর্ষপূর্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। প্রতিটা ব্যস্ত বছরের ব্যস্ততা ব্যাবিলনে ক'টি মানুষের জন্য আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায় নভেম্বর মাসটা এলেই।

চলতি বছরটা অনেক অর্থে প্রতিকূল একটা বছরই বটে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি। বেশি ব্যস্ত সময়ে ব্যবসা ভালো হয় না, বা বলা চলে, ব্যবসামন্দার সময়ে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। বৈরি আবহাওয়া, অতিবৃষ্টি এসব ছিল এ বছরে ঢের, তবে মনুষ্যসৃষ্ট উল্লেখযোগ্য কোনো বিপর্যয় এ বছর বিপর্যস্ত করেনি দেশটাকে। তবুও গার্মেন্ট শিল্পের জন্য কোনোভাবেই ২০১৭ সাল (নভেম্বরের প্রান্ত পর্যন্ত) লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়ার তো নয়ই, লক্ষ্য অর্জনের বছরও হতে পারেনি।

সংবাদমাধ্যমগুলো অনুসরণ করলে মনে হয়, বা বিশ্বাস হয় যে দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন হচ্ছে। সামগ্রিক রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকলেও তা বেড়ে চলেছে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণও বাড়ছে, বাড়ছে অল্প করে হলেও জাতীয় আয়ের মাথাপিছু হার। ভুললে চলবে না, মাথাও কিন্তু বেড়ে চলেছে উচ্চ হারে। লেখা-পড়া, উচ্চশিক্ষার হার, সবই বাড়ছে। বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা আমেরিকার মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র বা গুগলের মতো কোম্পানিগুলোতে নাম করছে– বিশ্বমানের। দেশের মানুষ সরকারি বেসরকারি সর্বক্ষেত্রেই দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে, উন্নত দেশগুলো ঘুরে দেখছে, সেখানে নানান বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বহু বিদেশী সংস্থা বাড়ি এসে বিনে পয়সায় বা ক্ষেত্র-বিশেষে পয়সার বিনিময়ে কত কী শেখাচ্ছে আমাদের। কিন্তু তারপরও কীভাবে এখনো যানজটে শহরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত, বর্ষা মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রায় অচল হয়ে যাচ্ছে। এসবের ফলে জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করে নিয়মিত জানিয়ে দিচ্ছেন তাবৎ বিশেষজ্ঞরা। জিডিপি -র এক, দেড়, বা পুরো দুই শতাংশ নাকি ওভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও এর কোনো স্থায়ী সমাধান বা প্রতিকার হচ্ছে না কেন তা আমার মাথায় ঢোকে না।

বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যাক। রানা প্লাজা ধ্বসে পড়ল না তো, পুরো আকাশটাই যেন এই শিল্পের মাথার উপর এসে পড়ল। মন্দ, মাঝারি ভালো, প্রায় ভালো, ভালো, সব পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর সমভাবে, নির্বিচারে যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাজেল হয়ে গেল। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে শোচনীয়দশামুক্ত করার জন্য ভূই ফুঁড়ে বেরিয়ে এল মহাপরাক্রমশালী দু'টি প্রতিষ্ঠান। একই শিল্পকে বাঁচাবার অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করতে আসা সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি প্রতিষ্ঠান বহুক্ষেত্রে ভিন্ন মত ও আদর্শ নিয়ে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে

পড়ল। ফলে যা হবার তাই হলো। এ বলছে এভাবে চলো, এভাবে করো। ও বলছে আমাদের কথা শোনো, ওভাবে চলো, ওভাবে করো। অনেক জরুরি বিষয়ে এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের মতৈক্য হতে বছরাধিককাল লেগে গেল। ফলে গোটা ৪০ লক্ষ কর্মী-কর্মচারীর শিল্পটি, দেশের ৮০ শতাংশ বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পটি এক অবর্ণনীয় ভোগান্তির মুখে পড়ল। এ দেশে রপ্তানিমুখী গার্মেন্ট শিল্পের তাবৎ প্রতিষ্ঠান কীভাবে ঢেলে সাজিয়ে চালাতে হবে তা বাৎলে দেবার ও সেসব নিশ্চিত করার এই দুই প্রতাপশালী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ক্রেতা কোম্পানিগুলোর নিজস্ব নিয়ম-কানুন, চাহিদাগুলোও কিন্তু দিব্যি বহাল রয়ে গেল। তাতে সমস্যা আরো বাড়ল, জটিল হলো। এ যেন পোশাক বানানো নয়, বোয়িং বা এয়ারবাস কোম্পানির জন্য যাত্রীবাহী বিমান তৈরির কারখানা, যেন যাত্রীদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে কমপ্লায়েন্সের জন্য। রানা প্লাজার আগে দশক দশক ধরে এসব কোম্পানি কী করে ব্যবসা করেছে বাংলাদেশে ভেবে পাই না। এ দেশের শ্রমিক কর্মচারীর নিরাপত্তা বিষয়টা যেন হঠাৎ আবিষ্কার। প্রচলিত হয়ে গেল 'জিরো টলারেন্স' বা 'কোনো ছাড় নেই' বিষয়টা। ন্যায্য, ততটা ন্যায্য নয়, বা মোটেও ন্যায্য নয়, (আমার নিজস্ব মত) এরকম সকল চাহিদা মেটাতে গিয়ে শিল্পের কোমর ভেঙে যাবার জোগাড়, কিন্তু ক্রেতাদের কেউ আন-এথিকাল সোর্সিং বা নৈতিকতা বহির্ভূতভাবে ক্রয় না করে সেটা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বা তাদের কোনো বিষয়ে কোনো 'জিরো টলারেন্সের' বিধিনিষেধ দেয়া হলো না অদ্যাবধি। এদিকে কিন্তু বিদেশী সংবাদমাধ্যম বা উত্তর আমেরিকার নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেড়াতে আসা অধ্যাপকরা বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ভ্রমণে আসা পার্লামেন্টারিয়ানরাও আমাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে নিজেরাই প্রশ্ন তুলছেন- ক্রেতাদের কমপ্লায়েন্স কোথায়? কেন এতদিনেও কেবল একটা সম্পূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড হলো না বস্ত্রশিল্পের জন্য কোড অব কন্ডাক্টের? বুঝুন! এ কী পরিহাস, না প্রহসন?

আমরা শিল্প মালিকরা, আমাদের সমিতি বা দেশের সরকার, কেউই পারছি না শিল্পে একটা ন্যায্য ব্যবস্থা আনতে, যেখানে কেউ হারবে না, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ জিতবে। সদিচ্ছায় সবই সম্ভব, কিন্তু এ যাবৎ তা সম্ভব হয়নি। শুধু বড় অঙ্কের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা দিলেই হবে না, তা কীভাবে অর্জিত হবে, বা হবে না– তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে বিধান দিতে তো হবে। তবেই না কিছু অর্জিত হবে, নয়তো প্রাকৃতিক নিয়মে যা হয় তাই হবে। পরিবেশ অনুকূলে থাকলে ভালো, নয়তো কোনো বিশেষ প্রাপ্তি নয়। কিন্তু এভাবেতো চলতে পারে না, চলা উচিৎ নয়। যাক ওসব কথা, নিজেদের কথায় আসি এবার।

নতুন কী হলো ব্যাবিলন পরিবারে এ বছর? কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে বটে নিয়মিতগুলোর পাশাপাশি। লন্ডন শহরে আমরা একটা ডিজাইন অফিস প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি অবশেষে। দু'জন ব্রিটিশ ডিজাইনার সেখানে কাজ করছেন আমাদের জন্য। আমরা বেশ আশাবাদী যে এই সংযোজন ক্রেতাদের জন্য আমাদের সেবার মান ও পরিধি বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে। আমাদের স্ক্রিন প্রিন্টিং ফ্যাক্টরি, এম্ব্রয়ডারি ফ্যাক্টরি- এ দু'টো এখন নতুন

জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। সেখানে এগুলো সুপরিসর জায়গা পেয়েছে, কর্মীরা অধিক নিরাপদ, আরামদায়ক কাজের পরিবেশ পেয়েছে। আমাদের নিটিং ফ্যাক্টরিও আরো বড়ো জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এর ফলে আমাদের ফ্যাব্রিক ডাইং কারখানার বর্তমান বর্জ্য-শোধনাগারটির (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন সম্ভব হবে। ওটি এখন সম্পূর্ণ বায়োলজিক্যাল শোধনাগারে উন্নীত হবে। সেই কাজ গত কয়েক মাস ধরে চলছে পুরোদমে। এটা একটা জটিল ও বিশাল কাজ, প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এই আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের কাজটি করা হচ্ছে ক্রেতা চাহিদা মেটাবার জন্য। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিঙের কাজ জমি-সংক্রান্ত কিছু জটিলতার কারণে বছর দু'য়েক বন্ধ থাকার পর এখন তা এ বছরে পুণরায় চালু হয়েছে। এটি আমাদের ট্রাউজার ফ্যাক্টরিটির জন্য শুধু ক্যাপাসিটিই বাড়াবে না, এটা হবে প্রযুক্তির দিক থেকে আধুনিক একটি ফ্যাক্টরি।

গেলবারের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর জনাব প্রফেসর ড. আবদুর রব। এবারের সংখ্যায় ওঁর শুভেচ্ছা-বক্তব্য পড়ে দেখুন। তিনি ব্যাবিলনকে তাঁর বক্তব্যে মহিমান্বিত করেছেন। সকল ব্যাবিলনিয়ানকে আমার উপদেশ হলো, আমাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ওনার উচ্ছ্বাস, প্রশংসা, আশাবাদ, কিছুই যেন মিথ্যে না হয়, কোনোদিন। আমাদের মৌখিক ধন্যবাদের চাইতে ওতেই তিনি সম্মানিত হবেন বেশি।

ব্যাবিলন কথকতা-র এই সংখ্যাটি, একটি বিশেষ সংখ্যাকে বাদ দিলে, বারোতম। বারোতম হিসেবে এটিকেও আমি বিশেষ চোখেই দেখছি, এক ধরনের তৃপ্তিবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করছে। সহ-সম্পাদক মাহমুদ, কম্পোজ ও প্রুফ রিডিংয়ে আরিফ এবং আরো অনেকের উৎসাহ ও বাড়তি শ্রম প্রদানের কারণে এ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আমার কাজ দিনে দিনে কমে গেছে অনেক। ওদের কৃতিত্বে ভাগ বসিয়ে আর কতদিন বসে থাকব সেটাও ভাবছি। অদূর ভবিষ্যতে একেবারে বাদ না পড়ে গিয়ে সভাপতি হয়ে গাঁট হয়ে থাকলে কেমন হয়? যাহোক, গত সংখ্যাসহ বর্তমান সংখ্যার সকল লেখক-লেখিকা ও কলাকুশলীকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর আছে আসন্ন বিজয় দিবস ও টগবগিয়ে ছুটে আসতে থাকা ২০১৮ এর আগাম শুভেচ্ছা। আগামী বছরটি দেশের বস্ত্র শিল্পের জন্য, এর সাথে জড়িত সকল শ্রমিক-কর্মচারীর জন্য, তথা বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলকর হোক, শুভ হোক।

এসএম এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক
১৩ ডিসেম্বর ২০১৭

ব্যাবিলন এবং আমি

মুহাম্মদ সাইফুল হক
প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

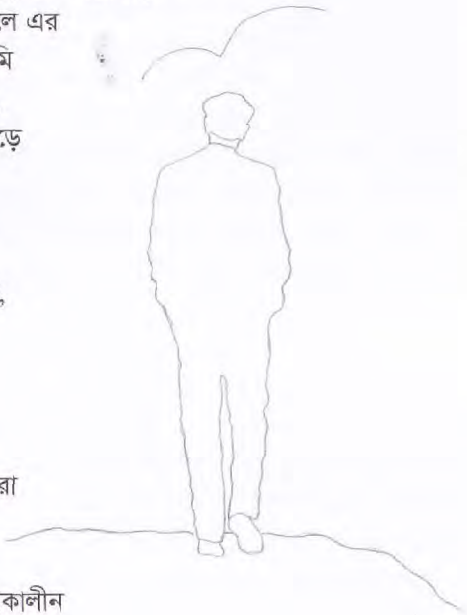

মাছ ডাঙাতে না এলে যেমন জলের গুরুত্ব বুঝতে পারে না, তেমনি বোধ হয় ব্যাবিলন থেকে না বেরোলে এর সুশীতল ছায়ার আরাম বোঝা যায় না। আমি কখনোই কেবল আরাম প্রত্যাশী ছিলাম না, বরং প্রাপ্য আরামটুকু যাতে হুমকিতে না পড়ে তার জন্য বরাবরই পরিশ্রমে বিশ্বাসী। ছাত্রজীবনে খেলার নেশাটা কেটে গেলে পড়াশুনাতে ভালো করার জন্য চলল বেশ অক্লান্ত পরিশ্রম। সফলতাও আসলো তাতে, তবে তা চূড়ান্ত নয়। পেশাজীবনটাতে এসে বুঝলাম– ছাত্রজীবনটাতে কতইনা স্বাধীনতা ছিল। তবে ভাগ্য ভালো যে পেশাজীবনটা শুরু হলো ব্যাবিলন নামক স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে। আঠারো বছর যে কীভাবে চলে গেল বুঝেই উঠতে পারিনি। এইতো গত ভালোবাসা দিবসে আমার ফেয়ারওয়েল ছিল। ব্যাবিলনে থাকাকালীন যে বিষয়টা আমাকে সব সময় স্বাচ্ছন্দ্যে রাখত এবং কিছুটা গর্বিতও করত সেটা হলো সেখানকার কর্ম পরিবেশ। সত্যি কথা বলতে আমি শুরু থেকেই পেয়েছি সেই পরিবেশ। মাননীয় পরিচালক এমদাদ স্যারের সাথে ইন্টারভিউয়ের দিনেই তাঁর যে চমৎকার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছি তা আমাকে ব্যাবিলনের শেষ দিন পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রেখেছিল। প্রথম দিনেই বুঝেছি স্যারের সাথে থাকতে পারলে নিজের উন্নতি নিশ্চিত করতে পারব। সত্যি কথা বলতে সেটা তো হয়েছে বটেই।

বলছিলাম ব্যাবিলনের কর্ম পরিবেশের কথা। সহকর্মী হিসেবে ব্যাবিলনে যাদের পেয়েছিলাম তারাও সত্যিই ছিলেন চমৎকার সব মানুষ– শিক্ষানুরাগী ও কঠোর পরিশ্রমী। ব্যাবিলনে আঠারো বছর কাজের সুবাদেই শিখেছি কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতে হয়। তাইতো আজ আমি অন্য একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারছি। আমার নতুন প্রতিষ্ঠানের মানুষগুলোকে আমি প্রায়শ

ব্যাবিলনের কথা বলি। বলি সেখানকার কর্পোরেট প্র্যাকটিস ও পরিবেশের কথা। দু'একজন কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে– এতই যদি ভালো তাহলে আপনি ব্যাবিলন ছাড়লেন কেন? তখন আমি উত্তর দেই– ব্যাবিলন যে ভালো আর ব্যাবিলনের কর্মীরাও যে ভালো তাই প্রমাণ করার জন্য। অনেকেই তা বিশ্বাস করে এবং বলে– হ্যা আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি যেন বিশেষ কোনো ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন। আপনার ব্যবহার, কাজ, সময়ানুবর্তিতা প্রকাশমান। আমরা আপনাকে ভালোবাসি। আমার বুকটা সত্যিই তখন ভরে যায় আর দর্পভরে বলতে থাকি 'ব্যাবিলন কথকতা'র কথা। কয়েকজনকে কপিও দিয়েছি। তারা পরে এসে বেশ প্রশংসাও করেছে। আজকেও যখন নিজের অনুভূতিগুলো খাতায় লিখছি আর ভাবছি তা ব্যাবিলন কথকতায় ছাপা হবে তখন বেশ শিহরিত হচ্ছি। মনে হচ্ছে ব্যাবিলনে আগের মতো প্রতিদিন অফিসে না গেলেও আমি ব্যাবিলনকে আমার সাথেই দেখতে পাচ্ছি। আমার সাবেক সহকর্মীদের আমার এই সত্য উপলব্ধিটা জানাতে ভালো লাগছে। ব্যাবিলনে যে অসাধারণ সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান তা যেন তারা উপভোগ করে ও মূল্য দেয়।

কখনো কখনো সাবেক ব্যাবিলনিয়ানদের সাথে দেখা হয় আর দেখা হলেই যেন স্মৃতিচারণ একটি নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে গেছে। আমি ভাবছি, সাবেক ব্যাবিলনিয়ানদের একটা সংগঠন করব আর তাদের মাঝে আমন্ত্রণ জানাব বর্তমান ব্যাবিলনিয়ানদের। তৈরি হবে ব্যাবিলনের সাবেক ও বর্তমানদের সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন। আর তা দেশ ও দশের মাঝে মানবতার কাজের জন্য ছড়িয়ে যাবে। ব্যাবিলন কথকতার মাধ্যমে একটা বার্তা দিতে চাই– যে একবার ব্যাবিলনিয়ান হয় সে যেন চিরকালের জন্যই হয় এবং ব্যাবিলনিয়ানদের সেই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মানবিক ও আকর্ষণীয় পেশাদারিত্ব ছড়িয়ে দেয় সকলের মাঝে।

ব্যাবিলনের সাথে আঠারো বছরের জীবনে অনেক স্মৃতিতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। সহকর্মীদের সাথে প্রতিদিনের মধ্যাহ্নভোজন, বিভিন্ন সময়ে নানা কার্যক্রম, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, শীতার্তদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ– সবকিছু খুব মনে পড়ে। যেটা আমাকে সবচেয়ে গৌরবান্বিত করে তা হলো– ২০০৬ সাল থেকে ব্যাবিলন কথকতার একজন সংগঠক হিসেবে নিজের সম্পৃক্ততা। আজ আমি ব্যাবিলনের বাইরে, অর্থাৎ নৈমিত্তিক কাজের বাইরে কিন্তু তারপরও একজন অতি সাধারণ লেখক হিসেবে ব্যাবিলন কথকতায় ঠাঁই পাওয়াটা সৌভাগ্যের বিষয় হিসেবে মনে করি। কোনোদিনও ভুলব না ব্যাবিলনের সিলভার জুবিলিতে অংশ নিতে পারার সৌভাগ্যকে। আসলে ব্যাবিলনের কাছে আমি ভীষণ ঋণী আর সেই ঋণ আমি কোনোদিনও শোধ করতে পারব না। বর্তমান কর্মক্ষেত্রে আমি সর্বদাই ব্যাবিলনের ভালো চর্চাগুলোকে উল্লেখ করি এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টাও করি। ব্যাবিলনের মাটি ভালো চর্চাকে বাস্তবায়নের জন্য যতটা উর্বর তেমন আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা আমি এখনও জানি না। আজকাল আমার মনে হয়, কর্মজীবনের

ব্যাবিলনের কথা বলি। বলি সেখানকার কর্পোরেট প্র্যাকটিস ও পরিবেশের কথা। দু'একজন কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে– এতই যদি ভালো তাহলে আপনি ব্যাবিলন ছাড়লেন কেন? তখন আমি উত্তর দেই– ব্যাবিলন যে ভালো আর ব্যাবিলনের কর্মীরাও যে ভালো তাই প্রমাণ করার জন্য। অনেকেই তা বিশ্বাস করে এবং বলে– হ্যা আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি যেন বিশেষ কোনো ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন। আপনার ব্যবহার, কাজ, সময়ানুবর্তিতা প্রকাশমান। আমরা আপনাকে ভালোবাসি। আমার বুকটা সত্যিই তখন ভরে যায় আর দর্পভরে বলতে থাকি 'ব্যাবিলন কথকতা'র কথা। কয়েকজনকে কপিও দিয়েছি। তারা পরে এসে বেশ প্রশংসাও করেছে। আজকেও যখন নিজের অনুভূতিগুলো খাতায় লিখছি আর ভাবছি তা ব্যাবিলন কথকতায় ছাপা হবে তখন বেশ শিহরিত হচ্ছি। মনে হচ্ছে ব্যাবিলনে আগের মতো প্রতিদিন অফিসে না গেলেও আমি ব্যাবিলনকে আমার সাথেই দেখতে পাচ্ছি। আমার সাবেক সহকর্মীদের আমার এই সত্য উপলব্ধিটা জানাতে ভালো লাগছে। ব্যাবিলনে যে অসাধারণ সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান তা যেন তারা উপভোগ করে ও মূল্য দেয়।

কখনো কখনো সাবেক ব্যাবিলনিয়ানদের সাথে দেখা হয় আর দেখা হলেই যেন স্মৃতিচারণ একটি নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে গেছে। আমি ভাবছি, সাবেক ব্যাবিলনিয়ানদের একটা সংগঠন করব আর তাদের মাঝে আমন্ত্রণ জানাব বর্তমান ব্যাবিলনিয়ানদের। তৈরি হবে ব্যাবিলনের সাবেক ও বর্তমানদের সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন। আর তা দেশ ও দশের মাঝে মানবতার কাজের জন্য ছড়িয়ে যাবে। ব্যাবিলন কথকতার মাধ্যমে একটা বার্তা দিতে চাই– যে একবার ব্যাবিলনিয়ান হয় সে যেন চিরকালের জন্যই হয় এবং ব্যাবিলনিয়ানদের সেই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মানবিক ও আকর্ষণীয় পেশাদারিত্ব ছড়িয়ে দেয় সকলের মাঝে।

ব্যাবিলনের সাথে আঠারো বছরের জীবনে অনেক স্মৃতিতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। সহকর্মীদের সাথে প্রতিদিনের মধ্যাহ্নভোজন, বিভিন্ন সময়ে নানা কার্যক্রম, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, শীতার্তদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ– সবকিছু খুব মনে পড়ে। যেটা আমাকে সবচেয়ে গৌরবান্বিত করে তা হলো– ২০০৬ সাল থেকে ব্যাবিলন কথকতার একজন সংগঠক হিসেবে নিজের সম্পৃক্ততা। আজ আমি ব্যাবিলনের বাইরে, অর্থাৎ নৈমিত্তিক কাজের বাইরে কিন্তু তারপরও একজন অতি সাধারণ লেখক হিসেবে ব্যাবিলন কথকতায় ঠাঁই পাওয়াটা সৌভাগ্যের বিষয় হিসেবে মনে করি। কোনোদিনও ভুলব না ব্যাবিলনের সিলভার জুবিলিতে অংশ নিতে পারার সৌভাগ্যকে। আসলে ব্যাবিলনের কাছে আমি ভীষণ ঋণী আর সেই ঋণ আমি কোনোদিনও শোধ করতে পারব না। বর্তমান কর্মক্ষেত্রে আমি সর্বদাই ব্যাবিলনের ভালো চর্চাগুলোকে উল্লেখ করি এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টাও করি। ব্যাবিলনের মাটি ভালো চর্চাকে বাস্তবায়নের জন্য যতটা উর্বর তেমন আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা আমি এখনও জানি না। আজকাল আমার মনে হয়, কর্মজীবনের

বাকি সময়টাতে আমি ব্যাবিলনকে ভীষণভাবে অনুভব করব। আজ যারা ব্যাবিলনে আছেন তাদের বলব এটা আমার মনের কথা, প্রাণের কথা, সর্বোপরি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা। আজ যখন কোনো ডাক পাই ব্যাবিলনের কোনো অনুষ্ঠানে– ইফতার পার্টি কিংবা প্রশিক্ষণ বা অন্য যেকোনো উপলক্ষ্যে– মনটা শান্তিতে ও গর্বে ভরে যায়। সবাইকে বার বার করে বলতে থাকি, এই যে, দ্যাখো ব্যাবিলন আমাকে ডেকেছে। আজ বুঝি, ব্যাবিলন আমার কতটাই না আপন ছিল। আজ তাই ব্যাবিলনকে জানাই আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। 'ব্যাবিলন কথকতা' চিরজীবি হোক।

কে জানত যে সত্যিই দেখা হবে

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

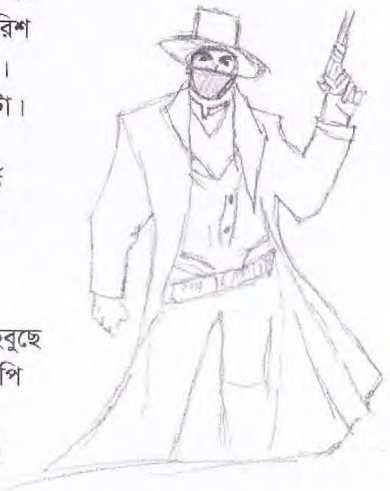

কীভাবে যেন 'কুমিল্লা ড্রাই ক্লিনার্স (লন্ড্রি)'– এর সামনেই দাঁড়িয়ে গেলাম হেভেন আর আমি। তিরিশ মিনিটের বেশি সময় হত্যা করতে হবে আমাদের। ভাবছিলাম কতটা হেলায় ফেলায় করা যায় কাজটা। বেলা এগারোটার আগে ডাক পড়বে না, তাও পাওয়া যাবে মোটে পাঁচটা মিনিট– আগেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে আমাদের। কোনোভাবেই এই সুযোগ হাতছাড়া করার উপায় নেই। নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টারও বেশি আগে চলে আসায় দুই ভাই মিলে শাহবাগের ফুলবাজার থেকে বেছেবুছে এগারোটা তাজা গোলাপ কিনতে পেরেছি, গোলাপি আর হলুদ এই দুই রং মিলিয়ে। অগুনতি ফুলের বিপণি থাকা সত্ত্বেও তাজা ফুলের বড়োই অভাব। আমার জন্য বলতে গেলে একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। ইচ্ছে করে অনেক সময় লাগিয়ে ফুল বাছাই করেছি, কারণ– ওই যে হাতের বাড়তি সময়কে বধ করতে হবে! এই অবসরে আমাদের দেশে ফুল ব্যবসার বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছি সেদিন অল্প সময়ে। কিন্তু সে কথা এখানে নয়।

ঘড়ি দেখে একসময় গাড়ি ছুটাতে বললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। তাও প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে পৌঁছে গেলাম। হেভেন ফোন করে জানিয়ে দিলো যে আমরা এসে পড়েছি। ভেবেছিলাম হয়তো সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের আগেও ডাক পড়ে যেতে পারে– না, তা হলো না। তাই বাড়িটির দু'পাশে লেগে থাকা ছোটো ছোটো দোকানপাট ঘুরে দেখতে লাগলাম, সাথে চার-পাঁচতলা পুরোনো বাড়িটিও। সব দোকান খোলেওনি তখন। কুমিল্লা ড্রাই ক্লিনার্সের ভিতরে তার মালিক ও দোকানের সামনে একটা টুল পেতে কপালের উপরে চশমা তুলে রেখে বসে থাকা শুভ্র চাপদাড়িমণ্ডিত লাল-সাদা গেঞ্জি পরা ভদ্রলোক আমাদের দু'জনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। তা, আমাদের ভাব-ভঙ্গিতে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল বৈকি।

– কী খোঁজেন আপনারা? চাপদাড়ি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

লোকটার কণ্ঠস্বরে বিপজ্জনক কিছু না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম ওখানেই।

– ওইটা কাজী আনোয়ার হোসেনের বাড়ি না? ওনার সাথে দেখা করতে এসেছি। একতলা দোকানের মাথার উপরে উঁকি দিয়ে কিছুটা নীলের ছোঁয়া লাগানো চারতলা দালানটির দিকে

চেয়ে বললাম আমি।

– হ্যাঁ, এইটা কাজী আনোয়ার হোসেনের বাবার বাড়ি। কাজি মোতাহার হোসেনের। এবার মুখ খুললেন কুমিল্লা লড্রি। উনি আরো জানালেন যে ওনার বড়ো ভাই কাজি মোতাহার হোসেনের দেখাশুনাও করেছেন তাঁর জীবদ্দশায়।

ইতোমধ্যে আমার ছোটো ভাই হেভেন বা শহীদুল ইসলামের অফিসের একজন কর্মচারীও এসে যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে। আমার মনে হলো আশেপাশেই কোথাও থাকেন ভদ্রলোক।

কাজী আনোয়ার হোসেন, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০- লেখা সম্বলিত একটা সাইন লাগানো রয়েছে নীলকান্তমণি রঙের দেয়ালের এক জায়গায়।

এর মধ্যে ওই দু'জনের সাথে গল্প জমে উঠেছে। এদের কথানুযায়ী কাজী আনোয়ার হোসেনের বড়ো বোন (সানজিদা খাতুন নন) অনেক দিন আগে এদেরকে এসব দোকান-ঘরে ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছেন। সেই কবে থেকে আজো তারা আছেন আর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছেন কাজি পরিবারের বদান্যতার কথা। সময় কাটাবার তাগিদ ও কাজিদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানার আগ্রহে আমরা দু'ভাই দারুণ মনোযোগী শ্রোতা হয়ে গিয়েছিলাম দু'জন উৎসুক বক্তার। এক সময়তো আবেগের বশবর্তী হয়ে হেভেনকে বলেই বসলাম যে কোনো কারণে আজ যদি আমাদের অ্যাপয়ন্টমেন্ট বাতিলও হয় তো তেমন দুঃখ পাব না, কারণ এই দু'জনের কাছ থেকে এঁদের সম্পর্কে যা শুনলাম, যার সবই ভীষণ জানার মতো বিষয়, সেগুলো এদের কাছে এসে না দাঁড়ালে হয়তো কোনোদিনই জানতে পারতাম না। ফোন-ক্যামেরা দিয়ে চটপট ওদের দু'জনের ছবি তুলে ফেললাম।

হেভেনের ফোনে ফোন এসেছে কাজী আনোয়ার হোসেনের কোনো স্ট্যাফের কাছ থেকে। আমরা প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাঁচ মিনিট বাকি এগারোটার। দ্বাররক্ষীর আসনে বসা একমাত্র যুবকটির হাতে ধরা সেবা প্রকাশনীর রহস্য পত্রিকার একটা সংখ্যা। বিষয়টি দারুণ সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও তা দেখে এক বিশেষ ধরনের ভালো লাগা মন ছুঁয়ে গেল আমাদের দুই ভাইয়েরই। আমাদের একটু বসতে বলা হলো। এই মুহূর্তে কেউ রয়েছে সেবা প্রকাশনীর সেই প্রবাদপুরুষের ঘরে।

বসে থেকে অপেক্ষা করতে করতে মন চলে গেল সেই ১৯৬৭ সালের কোনো এক সময়ে। তখন বরিশালের পুলিশ লাইনের দক্ষিণ দিকে আমবাগান এলাকায় থাকি। গল্পের বই পড়ার বাজে (?) অভ্যাস তারও অনেক আগে থেকে। অভ্যাস না বলে নেশা বলা ভালো। কাজেই প্রতিবেশী এক বন্ধু যখন বইটি দিলো আমাকে তখন একটুও দেরি না করে পড়তে লেগে গেলাম। কোনো এক বিদ্যুৎ মিত্রের লেখা 'স্বর্ণমৃগ।' সদ্য টিনেজ ক্লাবে যোগ দিয়ে এর আগে যে ধরনের বই পড়েছি সেগুলো যদি হয় সতীনাথের চটুল গান তো এই বই সরাসরি আমাদের মাইকেল জ্যাকসনের মঞ্চের সামনে বসিয়ে দিলো। (মাইকেল জ্যাকসন যদিও অনেক পরের কথা, তবু উদাহরণ হিসেবে বলছি আর কি)। এর আগে পড়েছি- রাত যখন বারোটা, রাত্রি যখন তিনটা বাজে, লেফটেন্যান্ট হত্যা; শশধর দত্তের- দস্যু মোহন,

স্বপন কুমার সিরিজ, টারজানের বাংলা অনুবাদ, ইত্যাদি। ওগুলো পড়ার নেশায় সারাদিন বুঁদ হয়ে থাকতাম। কিন্তু বিদ্যুৎ মিত্রের এই মাসুদ রানা সব নেশার শিরোমণি হয়ে এল আমার মতো পাঠকদের কাছে। এরপর এল 'কুয়াশা' তরুণদের স্বপ্নপুরুষ হয়ে। যুবকদের মাতাচ্ছে 'মাসুদ রানা,' কিশোর-তরুণদের কুয়াশা। আমাদের কোনো সোহরাব-রুস্তম ছিল না, ছিল না কোনো জ্যাসন বা থেসিউস- জাতীয় বীর হিসেবে– কিন্তু হঠাৎ যেন আকাশ থেকে সেই রকম দুই বীরকে মাসুদ রানা ও কুয়াশার রূপ দিয়ে নামিয়ে আনলেন বিদ্যুৎ মিত্র নামের এক- সেই পর্যন্ত অজানা- লেখক। তবে তিনি যেন এলেন বিদ্যুতের গতি, তেজ ও শক্তি নিয়েই, আর এসেই করলেন জয়। বয়স্করা, যারা ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে আর সহজাত অলসতা ভেঙে গল্পের বই পড়তে চাইতেন না, এখন তারাও ছেলের অগোচরে তার মাসুদ রানা বা কুয়াশাটি হাতিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলেন। প্রথমে কৌতূহলবশত, পরে অভ্যাসবশত। এক সময় পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এই জাদুকরি লেখক স্বনামে, কাজী আনোয়ার হোসেন, আমাদের কাজীদা। জন্ম নিল সেগুনবাগান প্রকাশনীর বা সেবা প্রকাশনীর। এখনকার মতো সে সময়টা তথ্যপ্রযুক্তির বা ইন্টারনেটের ছিল না। বহির্বিশ্ব বা পশ্চিমা জগৎ, তাদের সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস সাধারণের দৃষ্টিসীমা ও নাগালের বাইরে। এহেন পরিস্থিতিতে কী এক অসাধারণ কাজেই না হাত দিয়ে বসলেন ড. কাজি মোতাহার হোসেনের এই সুযোগ্য পুত্রটি! মৌলিক রহস্য-গল্প লেখা ও প্রকাশের বাইরে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন পশ্চিমের ভাণ্ডারে। দেশে পাঠককুল তৈরির পাশাপাশি প্রতিভাবান লেখকদের জড়ো করলেন এক ছাতার নিচে, খুঁজে বের করতে থাকলেন লেখক প্রতিভা। সেবা প্রকাশনীর দক্ষ সেবায় কালে কালে কত লেখক যে তৈরি হলো। শেখ আবদুল হাকিম, জাহিদ হাসান, রাকিব হাসান প্রমুখরা রূপান্তর করতে থাকলেন অসাধারণ নিপুণতায় কালজয়ী সব গল্প, উপন্যাস বিশ্ব গ্রন্থশালা থেকে। রসাস্বাদনে সক্ষম হলাম আমরা অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, উইলবার স্মিথ, জেমস হ্যাডলি চেজ- এর মতো মাস্টারদের থ্রিলার, অপরাধ জগৎ ও রহস্য গল্পের। কাজীদা এরিখ মারিয়া রেমার্কের সর্বকালের সেরা উপন্যাস 'অল কোয়ায়েট অন দ্যা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'- সহ আরো অনেক ক্লাসিক গল্প উপন্যাস বাঙালি পাঠক-পাঠিকার সমীপে পরিবেশন করে আসছেন সেই কবে থেকে। বাদ যায়নি বিখ্যাত সব বিপুলভাবে জনপ্রিয় ওয়েস্টার্ন কাউবয় গল্পগুলোও। এসব লেখায় অংশ নিয়েছেন তাঁর দুই পুত্রসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও...

'আপনারা এখন যেতে পারেন, স্যার অপেক্ষা করছেন,' রহস্যপত্রিকা হাতে আমাদের স্বাগত জানানো কর্তব্যরত যুবকটির কথায় আমার সম্বিত ফিরে এল। হাতঘড়ি দেখে অবাক হলাম– মাত্র সাত মিনিট সময় অপেক্ষা করেছি, অথচ এরই মধ্যে স্মৃতির পাতা হাতড়ে কত কিছু দেখে এলাম।

বসে থাকা অবস্থায় বাড়িটির ভিতরে কোথাও থেকে এক ধরনের ধুপধাপ শব্দ আসছিল। হেভেন বলল– ছাপাখানার ছাপার শব্দ। বাড়ির মধ্যেই সেবা প্রেস। তাই হবে, ভাবলাম আমি।

পুরোনো বাড়িটির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে লক্ষ করলাম মোড়গুলোতে কোণায় কোণায় বই-পত্রের স্তূপ। এটা যে একটা প্রকাশনাঘর তার ছাপ বাড়িটির ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে। প্রতিটি তলায় নীল রঙ করা লোহার দরজা, সাথে খোলা ও বন্ধ করার জন্য আলাদা লোক। ম্যানেজার যুবকটি চারতলায় এসে থামলেন, ইশারা করলেন একটা কক্ষের দিকে। বুঝলাম এখানেই আছেন আমার স্বপ্নপুরুষ। হেভেন আগেই আমাকে বলে রেখেছিল কাজী অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। হয়তো শায়িত অবস্থায়ই দেখা দেবেন আমাদের। মানসিক প্রস্তুতি আমার ওরকমই। কিছুটা অস্বস্তিও হচ্ছিল শুয়ে থাকা প্রিয় মানুষটিকে কীভাবে সম্ভাষণ করব সেটা ভেবে। পা ছুঁয়ে সালাম করব কি? ব্যাপারটা নাটকীয় দেখাবে। নাহ্, এমনি সালাম দেব। এসব ভাবতে ভাবতে ম্যানেজারের ইঙ্গিতে ভেজানো দরজা ঠেলে আমিই প্রথমে ঢুকে গেলাম ঘরের মধ্যে। কোনোকিছু দেখার আগে কানে এসে লাগল লঘু আওয়াজে বাজতে থাকা তানপুরা কোনো শব্দ যন্ত্র থেকে। আমরা ঢুকতেই হাতের বাঁয়ে একটা ডেস্ক থেকে উঠে এলেন কাজী আনোয়ার হোসেন। আশ্চর্য! কাজ করছিলেন একটা ডেস্কটপ কম্পিউটারে অসুস্থ মানুষটি। তবে একজন শয্যাশায়ী রুগ্ন মানুষের চাইতে অনেক সুস্থ। কত বড়ো সৌভাগ্য আমাদের আজ পনেরো এপ্রিল বা বৈশাখের দ্বিতীয় দিবসে। আবেগ ও উত্তেজনায় নববর্ষের শুভেচ্ছা বলতে ভুলে গেলাম আমরা। কক্ষটি খুব বড়ো নয়। একটা টেবিল, তার ওপাশে চেয়ার, যেটাতে কাজী আনোয়ার হোসেন বসেন। তাঁর পিছনে একটা টানা অপ্রশস্ত টেবিল দেয়াল ঘেঁষে। টেবিলের এ পাশে দু'টো চেয়ার। তার পিছনে অথবা আগে প্রবেশ দরজার সাথেই প্রায় লাগোয়া একটা ছোটো সোফা। কাজীদাকে আমাদের পরিচয় বললাম, সাথে ধন্যবাদ দিলাম আমাদের আসার অনুমতি দেবার জন্য। তিনি স্মিত হেসে বসতে বললেন আমাদের, নিজেও গিয়ে টেবিলের ওপাশে তাঁর চেয়ারটিতে বসলেন। আমাদের সঙ্গের তৃতীয় ব্যক্তিটি এবং সেবার ম্যানেজার সাহেব বসলেন পেছনে দরজাসংলগ্ন সোফায়।

– আপনার সাথে পরিচয় আমার সেই ১৯৬৭ থেকে আপনার স্বর্ণমৃগ, মাসুদ রানার তিন নম্বর বইটির মাধ্যমে।

– তখন আমি বিদ্যুৎ মিত্র। তিনি মনে করিয়ে দিলেন।

– ঠিক ঠিক। বললাম আমি। – ওই নামেই মাসুদ রানা, পরে কুয়াশা লিখেছেন আপনি।

এরপর পাশে বসা ছোটো ভাই হেভেনের পরিচয় দিয়ে বললাম আমরা সব ক'টি ভাইবোনই আপনার নিয়মিত পাঠক-পাঠিকা দীর্ঘকাল ধরে। সেই সময় হেভেন যোগ করল যে সে রানা অর্থাৎ আমার তিন নম্বর ছোটো ভাইটি, যে কিনা ক্যানাডা প্রবাসী, তাকে জানিয়েছে আমাদের আজকের এই সাক্ষাতের কথা। এতে রানা ভীষণ আপসোস প্রকাশ করেছে যে এই সুযোগ তার কপালে জুটল না। তবে অনুরোধ করেছে কাজীদার সাথে অবস্থানের সময় যেন ভিডিয়ো ফোনকল করে তাকে একটু দেখানো হয়। হেভেন যখন ফোনে চেষ্টা করছে তখন আমি কাজীদাকে বললাম রানার কথা।

– এই ভাইটির নাম মইনুল ইসলাম, ডাক নাম রানা। রানাভক্ত ভাইটি সুযোগ পেলেই তার

নাম উল্লেখ করত মইনুল রানা বা ম. রানা বলে। ইংরেজিতে তো অবশ্যই এম. আর. বলে সে নিজেকে সংক্ষেপে। মাসুদ রানাকে বইতে কখনো কখনো এরকম সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কী রকম অবসেশন থাকলে কেউ এটা করতে পারে! এসব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন কাজীদা। কিছুটা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মইনুল রানার প্রবাস জীবনের কথা। কেন গিয়েছে, কী করে সেখানে ইত্যাদি। (এই অংশটুকু পড়ে ছোটো ভাই রানার ভালো লাগবে ভেবে এখনই ভালো লাগছে আমার)। হেভেন জানাল রানাকে ফোনে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। মনোযোগে ছেদ ঘটাচ্ছিল বলে আমি ওকে বললাম আর চেষ্টা না করতে।

– বিভিন্ন বইতে আপনি বিদেশের বর্ণনা দিয়েছেন বিশদ ও নিখুঁতভাবে– যেমন লন্ডন বা প্যারিস শহর। কীভাবে সম্ভব হয়েছে? এই প্রশ্ন করল হেভেন।

– পড়ে, পড়া ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। অভিজ্ঞতা থেকে সব সম্ভব নয়। ওসব জায়গায় যাইনি আমি কখনো। বললেন কাজীদা। এ কথায় ভীষণ অবাক হলাম আমরা দুই ভাই-ই। অবশ্য বাইরে লন্ড্রির সামনে দাঁড়িয়ে শোনা গল্পে এঁদের সম্পর্কে অনেক শুনে এসেছি। কাজীদার একটা ফোক্সওয়াগেন গাড়ি চালাবার কথা এরা বলেছে। তখন মনে পড়ে গিয়েছিল দুই ভাইয়েরই যে এই ব্র্যান্ডের গাড়িটির উল্লেখ প্রথম দিকের অনেক মাসুদ রানা ও কুয়াশার বইতে রয়েছে। এঁদের সবার অসাধারণ বিনয় ও অতি সাধারণ জীবনযাত্রার কথা বলেছে আবেগের সাথে বাইরে দোকানের লোক দু'টি। এখন এখানে বসে তার প্রমাণ পাচ্ছি স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে তা দেখে ও শুনে। অতি সাধারণভাবে সজ্জিত অফিস, চেয়ার টেবিলে উচ্চমূল্যের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আতিশয্য বিষয়টি দারুণভাবে উপেক্ষিত এই বাড়িটিতে– এ পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি তাতে সেটা বিশ্বাস করতেই হবে।

– ফোক্সওয়াগেন গাড়ির কথা আছে আপনার অনেক বইতে। আবারো বলল হেভেন।

– নিজে অনেক চালিয়েছি ওই গাড়ি। স্মিত হেসে বললেন রানা, কুয়াশা, রহস্যপত্রিকা ও অজস্র সেবা প্রকাশনার জনক।

হেভেনের এক প্রশ্নের জবাবে কাজীদা জানালেন, তিনি ভাই-বোনদের মধ্যে সপ্তম, আর তাঁর জন্ম লাগোয়া পাশের বাড়িটির (কাজি মঞ্জিল) নিচ তলায়। হেভেন আরো একটা মজার তথ্য দিলো যা আমার আগে জানা ছিল না। কাজীদার ডাক নাম নবাব। হেসে তথ্যটির সত্যতা স্বীকার করলেন কাজীদা। আরো জানলাম এটাই তাঁর বাড়ি। ভেবেছিলাম গুলশান বা বনানীতে হয়তো বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে, কিন্তু না– তা নেই।

এরই মধ্যে আমি একবার ঘড়িতে চোখ বুলিয়েছি। নির্ধারিত পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

– কাজীদা, আপনাকে আমরা ওই নামেই ডেকে থাকি- বললাম আমি। পরে বললাম– আপনি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, তার ভেতর থেকে আমাদের সময় দিয়েছেন, এতেই আমরা ধন্য ও আপ্লুত। কাজেই আমাদের যে কোনো সময় উঠে যেতে বলতে দ্বিধা করবেন না। এ কথার জবাবে কাজীদা কিছু বললেন না। তাঁর চেহারায় সতর্কীকরণের কোনো ছাপও ফুটে উঠল না, ফলে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম আমি।

– ছোটোবেলা থেকেই গল্পের বই পড়ার অভ্যাস করিয়ে দিয়েছিলেন আমার মা। তাঁর দৃষ্টিতে আগ্রহ লক্ষ্য করে আমি বলতে থাকলাম– আমার মায়ের সংগ্রহে থাকা যে বইটিতে আমার গল্পের বই পড়ার হাতে খড়ি সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ছোটোদের জন্য লেখা 'মহুয়া ও নদের চাঁদ,' এই বইটি। লক্ষ্য করলাম কাজীদার চোখদু'টো সকৌতুকে নাচছে। উৎসাহ পেয়ে আমি বলতে থাকলাম– মায়ের বইগুলোর মধ্যে আরো ছিল– 'লেফটেন্যান্ট হত্যা', আবুল হাশেমের লেখা 'পাহাড়ের বন্দি', পশ্চিমবঙ্গের কোনো লেখকের অনুবাদ করা 'অল কোয়ায়েট অন দ্যা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট,' ইত্যাদি। শেষের বইটির উল্লেখে কাজীদা একটু নড়েচড়ে বসলেন, বললেন– এ বইটি আমিও পড়েছি। খুবই সুন্দর ছিল অনুবাদটি। (কাজীদার এই কথায় একটু হতাশই হলাম আমি, কারণ ছোটোবেলায় ও বইটিতে দাঁত বসাতে আমার অনেক বেগ পেতে হয়েছে, পুরো বইটা পড়তে সময় লেগেছে অনেক। সেক্ষেত্রে সব সময় দোষ দিয়ে এসেছি আমি খটোমটো ভাষায় অনুবাদের। সেই তুলনায় অনেক পরে সেবা থেকে প্রকাশিত জাহিদ হাসানের রূপান্তরটি অনেক প্রাঞ্জল ও সুন্দর হয়েছে, সর্বজন পাঠোপযোগী হয়েছে)। এখন কাজীদা ওই বইটির প্রশংসা করায় বিপদে পড়ে গেলাম। ওই নাম মনে না পড়া পশ্চিমবঙ্গীয় অনুবাদকটির সমালোচনায় আর যাওয়া গেল না। শুধু বললাম,

– তবে কাজীদা, আপনার প্রকাশনা থেকে পরে জাহিদ হাসানের রূপান্তরটি কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল। ও বইটির বেশ ক'টা কপি আমি বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেছি। প্রত্যুত্তরে কাজীদা হাসলেন। পরে বললেন,

– প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর আগে একবার বাংলা একাডেমির বই মেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটি যুবক তার বন্ধুকে বলছিল, কেন্ বইটা, কেন্, ঠকবি না। ভালো না লাগলে পরে আমি পয়সা দিয়ে দেব। শুনে ভালো লাগার হাসি হাসলাম দুই ভাই।

– ছয় রোমাঞ্চ বইটি? কী চমৎকার সব অনুবাদ অসাধারণ কিছু রহস্য গল্পের! বললাম আমি। ও বইটা বাজারে নেই। ওর একটা গল্প, দি মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম, মনে আছে তোমার, হেভেন? – রেইনসফোর্ড?

– আপনার মনে আছে এখনো? – চোখেমুখে খানিকটা বিস্ময় মাখিয়ে বললেন কাজীদা। এতে যে খানিকটা গর্ব হলো আমার তা অস্বীকার করব না।

– রানার তো পুরো গল্পটা মুখস্ত। বলল হেভেন।

– এছাড়াও আপনাদের আরো অনেক বিদেশী বইয়ের অপূর্ব সব অনুবাদ রয়েছে। শেখ আবদুল হাকিমের নাম মনে করিয়ে দিলো হেভেন– অনন্য সাধারণ কাজ করেছেন তিনি।

– ও সতেরো-আঠারো বছর বয়সে আমার এখানে আসে। জানালেন কাজীদা।

– কেমন আছেন উনি? দেশে আছেন কি? প্রশ্ন হেভেনের।

– না, দেশেই আছে। তবে খুব অসুস্থ, জীবন-মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে সে। কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল আমাদের।

ইতোমধ্যে প্লেটে করে সমুছা, কেক, ফান্টা জাতীয় পানীয়র বোতল, ইত্যাদি টেবিলে পরিবেশন করে গেছে একজন। কাজীদা আমাদের খাবার তাগিদ দিলেন।

আমি দ্বিতীয়বারের মতো ঘড়ি দেখে তাঁকে আগের মতোই অনুরোধ করলাম, যখন মনে হবে তখনই যেন তিনি আমাদের উঠিয়ে দেন। সেরকম কিছুই করলেন না তিনি।

– আপনার এক সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম বেশ আগে। বললাম আমি। – সেখানে আপনি আপনার কিছু প্রিয় লেখক ও তাদের বইয়ের কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন আপনি। তার একটা বিশেষ বইয়ের কথাও বলেছিলেন আপনার সেরা পছন্দের একটি বই হিসেবে।

– কী নাম? জিজ্ঞেস করলেন কাজীদা।

– নামটা ঠিক মনে আসছে না আমার, বেলস টোল... জাতীয় কী যেন। নামটা মনে না করতে পেরে একটু বিব্রত হলাম।

– গানস অব ন্যাভারন?

– না।

– তবে কি, হোয়ার ইগলস ডেয়ার? – আবার জিজ্ঞেস করলেন কাজীদা। দারুণ বিব্রত হয়ে আবার জানালাম যে ওগুলো নয়। (পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, বইটি হলো– হোয়েন এইট বেলস টোল, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত। পরে গুগল করে বের করেছি)।

– উইলবার স্মিথ আরেকজন লেখক যার কথাও আপনি উল্লেখ করেছিলেন। এই সময় ৭/৮ বছরের একটি ছেলে এল ঘরটিতে একটা প্লেটে করে এক ধরনের পিঠা নিয়ে। কাজী ছেলেটিকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন যে এটি হলো তাঁর ছোটো ছেলের পুত্র। তার মানে কাজি মাইমূর হোসেনের ছেলে, যিনি একটু আগে ঘরে ঢুকে আমাদের পাশ দিয়ে লাগোয়া অপর একটা পাশের কক্ষে ঢুকে গেলেন। ছেলেটির নানি পিঠা বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন নাতিকে দিয়ে। কাজীদাকে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখতে এসে এরকম আন্তরিক আতিথেয়তা মোটেই আশা করিনি।

এর মধ্যে অনুমতি নিয়ে কাজীদাকেসহ ছবি তুললাম আমরা ফোন-ক্যামেরা দিয়ে। ভিডিয়ো ধারণ হলো একটু, তাও ওঁর অনুমতি নিয়েই। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম এসব ছবি ফেইসবুকে পোস্ট করতে পারব কিনা। কাজীদা মাথা নাড়লেন– পারব।

আমি তাঁকে আমাদের বার্ষিক পত্রিকা 'ব্যাবিলন কথকতা'র কথা বললাম, আরো বললাম যে বছর কয়েক আগে তাঁকে সেই পত্রিকার এক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম আমরা। এ বছর যদি ওই সময় তিনি সুস্থ থাকেন তো তাঁকে আবার দাওয়াত করতে পারি কিনা। জবাবে তিনি বললেন– দাওয়াত করতে পারবেন, কিন্তু আমি যেতে পারব না। এক সময় সাঁতারে যেতাম, অনেকদিন হলো তাও পারি না।

এরপর আমার তেমন কোনো আপসোস আর রইল না। ইতোমধ্যে কুড়ি মিনিট পেরিয়ে গেছে, এবং কাজীদা আমাদের উঠে যাবার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকুও করেননি। এই

অহঙ্কারটুকু বুকে ধারণ করে, কাজীদাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে, তাঁর সুস্বাস্থ্যসহ দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় নিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়েছিলেন আমাদের কাজীদা।

আমাদের জাতীয় জীবনে এই বিরল ব্যক্তিত্বটি তাঁর জীবদ্দশাতেই এক প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন, এটা দেশেরই গর্ব। এই নিভৃতচারী দারুণ প্রচারবিমুখ বিনয়ী মানুষটিকে, যিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন, তাঁর জন্য দেশের শিক্ষিত সমাজের তথা দেশের কিছু করার থাকলে সেটি করার সময় এখনই, নয়তো বড্ড দেরি হয়ে যেতে পারে।

আমার ভাই হেভেনকে ধন্যবাদ দিলে লম্বা মানুষটা খাটো হয়ে যাক তা আমি চাই না, তবে আশা করি যেই সূত্র ধরে কাজী আনোয়ার হোসেনের সাথে দেখা করার সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে সে, সূত্রের সেই মানুষটি বা মানুষগুলোকে নিশ্চয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে দিতে ভুলবে না ভাইটি আমার।

মমতাময়ী মা

মোহাম্মদ ইমাম হোসেন
জুনিয়র ম্যানেজার, মার্কেটিং
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

ছোটবেলায় আমি খুব দুষ্ট ছিলাম। আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে, আমি তখন ক্লাশ টু-তে পড়ি। বয়স ছয় থেকে সামান্য বেশি। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে। নাম মুক্তেশ্বরী। লোকমুখে শুনেছি এই নদীতে নাকি মুক্তা পাওয়া যেত। আদৌ কেউ কখনো মুক্তা পেয়েছে কিনা আমার তা জানা নেই। নদীটার এপারে আমাদের বাড়ি আর ওপারে আমাদের প্রাইমারি স্কুল। নদীটার উপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো (সেতু) বানানো– যা দিয়ে লোকজন পারাপার হতো। আমরাও ঐ সাঁকো পার হয়ে স্কুলে যেতাম। স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলেই মা বুঝতে পারতেন আমি নদীতে গোসল করছি। লাঠি হাতে এসে ভয় দেখিয়ে আমাকে নদী থেকে তুলে নিয়ে যেতেন মা। লাঠি হাতে আসতেন ঠিকই, কিন্তু কোনোদিনও গায়ে একটা টোকাও দেননি।

একইভাবে একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সাঁকোর পাশে জামা-প্যান্ট খুলে (তখন আমি অনেক ছোট) বইগুলো জামার ভেতর বেঁধে নদীর ঘাটে রেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার সাথে আমার আরো কিছু বন্ধু ছিল। নদীর স্রোত অতটা প্রবল নয়। আমরা একবার নদীর মাঝখানে যেতাম আর একবার ঘাটে এসে একটু বিশ্রাম নিতাম। আমরা যে ঘাটে বিশ্রাম নিতাম সেই ঘাটটির নাম ছিল মোড়লবাড়ি ঘাট। যদিও ঘাটটি মোড়লদের মালিকানায় ছিল না, কিংবা তাদের বাড়িটাও ঐ ঘাটে ছিল না। আমি আজো জানি না ঐ ঘাটটির নাম কেন মোড়লবাড়ি ঘাট ছিল, কোনোদিন কারো কাছে জানবার চেষ্টাও করিনি। তবে আমার মনে হয় ঘাটটির পাশে মোড়লদের কয়েকটি পুকুর ছিল সেজন্যই হয়তো নামটি হতে পারে। মোড়লদের পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ ছিল। ওরকম সাইজের মাছ তৎকালীন বাজারে তেমন পাওয়া যেত না। নদীতে পানি একটু বেশি থাকায় মোড়লদের একটি পুকুরের পাড় ভেঙে নদীর সাথে মিশে গিয়েছিল। মোড়লরা মাছ রক্ষার জন্য বাঁশ গেড়ে পাড়টি আটকে রেখেছিল। যাহোক, আমরা গোসল করছি আর বার বার নদীর

মাঝখান থেকে ঘাটে আসছি। একবার ঘাটে এসে একটি বাঁশে হাত দিয়েছি, অমনি দুইটা বাঁশ পানির মধ্যে নুয়ে পড়ল। বাঁশ যেখানে গাড়া ছিল সম্ভবত নিচের মাটি নরম হয়ে গিয়েছিল। বাঁশ নুয়ে পড়ার সাথে সাথে হড় হড় করে বড় বড় মাছ বেরিয়ে যেতে লাগল। যত দ্রুত সম্ভব আমি আর আমার এক বন্ধু বাঁশ দু'টি আবার আগের মতো করে গেড়ে দিলাম। ততক্ষণে কিছু মাছ বেরিয়ে গেছে, সঠিক বলতে পারব না তবে দশটির কম নয়। ঠিক ঐ সময় মোড়লের বড় ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরল। নদী থেকে উঠিয়ে আমাকে লাঠি দিয়ে শরীরের পিছন দিকে পেটাতে পেটাতে (বুঝতে পারছেন উলঙ্গ থাকলে পিছনে কোথায় পেটাতে পারে) উপরে নিয়ে একটা আমগাছের সাথে বেঁধে রাখল। আমার বন্ধুরা সবাই নদী থেকে উঠে দৌড়ে পালাল। আমাকে আমগাছে বেঁধে রেখেছে দেখে এলাকার বহু লোক জড়ো হয়েছে। আমাকে বেঁধে রেখেছিল, তাই আমি আঘাতের চেয়েও ভয়ে বেশি কাঁদছিলাম। একটা চোর ধরা পড়লে যেমন এলাকার লোক চারদিক ঘিরে রাখে ঠিক তেমন। ইতোমধ্যে আমার মাকে কে যেন খবর দিয়েছে আমি ইচ্ছা করে মোড়লদের পুকুরের মাছ ছেড়ে দিয়েছি, তাই মোড়লেরা আমাকে ধরে বেঁধে রেখেছে। রাগান্বিত হয়ে একটা লাঠি হাতে নিয়ে মা ছুটে এলেন আমার কাছে। দেখলাম মায়ের চোখে খুব রাগ। তখনও আমি গাছে বাঁধা, আমার শরীরের যেখানে লাঠির আঘাত করেছে সেখান থেকে চামড়া ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে মায়ের রাগান্বিত মুখটা মলিন হয়ে গেল, হাতের লাঠিটা হাত থেকে পাশে পড়ে গেল। দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। মা তখন তাদের কাছে জানতে চাইলেন, আমার ছেলে কী এমন অপরাধ করল যে তাকে বেঁধে এমনিভাবে মারলেন। তখন মোড়লের বড় ছেলে বলল, ওকে মারা হয়নি আরো মারতে হবে, বলে আবার আমাকে পেটাতে শুরু করল। মা সাথে সাথে আমার গায়ের উপর পড়ে আমাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন আর বলতে লাগলেন, আপনাদের যত খুশি আমাকে মারেন, কিন্তু আমার ছেলেকে আর মারবেন না। আমিও ভয়ে ভয়ে বলতে লাগলাম, মোড়ল, আমার মাকে মারেন আমাকে আর মারবেন না। মোড়ল আমার মায়ের গায়ে আরো কয়েকটি লাঠির বাড়ি দিলো। তারপর মাকে বলল, আমাদের পুকুর থেকে অনেক মাছ নদীতে ভেসে গেছে, এজন্য দশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। তৎকালীন ঐ টাকাটা জোগাড় করা যে কারো পক্ষেই দুরূহ ব্যাপার ছিল। আমার বাবা তখন মাছের ব্যবসা করতেন। তিনি মাছ নিয়ে কুমিল্লাতে গিয়েছিলেন। বাবাকে তখন পাওয়া সম্ভব ছিল না। তখনকার সময় মোবাইলের ব্যবহার ছিল না যে বাবাকে তৎক্ষণাৎ খবর পাঠানো যেত। কোনো উপায়ান্তর না দেখে মা তার হাত থেকে সোনার বালাজোড়া খুলে মোড়লদের হাতে দিয়ে দিলেন। মায়ের কাছে ঐ বালাজোড়ার দাম তার জীবনের চেয়েও বেশি ছিল, কারণ ওটাই ছিল তার কাছে আমার নানার দেয়া শেষ স্মৃতিচিহ্ন। সংসারের শত সমস্যার কবলে পড়েও আমার মা ঐ বালাজোড়া কখনো হাতছাড়া করেননি, কিন্তু আমার জন্য সেটাও সেদিন হারালেন। তার জীবনের সবচেয়ে দামি বালাজোড়া হারিয়েও ঐদিন তার চোখেমুখে বিন্দুমাত্র কষ্টের প্রতিফলন দেখা যায়নি। আমার বাঁধন খুলে মা আমাকে মুক্ত করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আঘাতের যন্ত্রণা আর ভয়ে তখন আমার

প্রচণ্ড জ্বর এসে গিয়েছিল। মা আমার হাত-মুখ ভালোভাবে ধুইয়ে বিছানায় শোয়ানোর পর আমার সারা শরীরে মলম মালিশ করছিলেন। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে আমি যতবার চোখ মেলেছি ততবারই দেখেছি মা কাঁদছেন। তখন আমি ভেবেছিলাম মাকে মোড়লরা মেরেছে এজন্যই হয়তো মা কাঁদছেন। সারারাত মা আমার পাশে বসেছিলেন। একটিবার এক মিনিটের জন্যও চোখ বোজেননি।

মা, এখন আমি তোমার দোয়ায় আর আল্লাহর মেহেরবানীতে অনেক বড় হয়েছি। লেখাপড়া শেষ করে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরি করছি। মা, এখন আমি বুঝতে পারছি ঐদিন কেন তুমি লাঠি নিয়ে মারতে গিয়েও আমাকে মারতে পারনি, কারণ তুমিতো আমাকে দেখেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলে। মার খাবার ভয়ে আমি আমাকে না মেরে তোমাকে মারতে বলেছি। আমি এখন বুঝি মা, ওটা আমার কত বড় ভুল ছিল, কারণ তুমিতো আমাকে আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার বুকের ভেতরে আগলে রেখে নিজে নীরবে আঘাত সহ্য করেছ। শরীরের সমস্ত চামড়া কেটে তোমার পায়ের জুতা বানিয়ে দিলেও তোমার ঋণের অতি ক্ষুদ্র পরিমাণও শোধ করা সম্ভব না। আমি বুঝতে পেরেছি যে বালা কিংবা তোমার জীবন নয়, ঐদিন আমার জীবনই তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মা, আমি এখন খুব ভালোভাবে বুঝি যে ঐদিন তুমি তোমার ব্যথায় সারারাত কাঁদনি, কারণ তুমিতো আমার ব্যথাতেই এতটা ব্যথিত ছিলে যে তোমার ব্যথাটা টেরই পাওনি। সারারাত জেগে আমাকে পাহারা দিয়েছ যেন আমার কোনো অসুবিধা না হয়। মাগো, তোমার একজোড়া বালার বিপরীতে দুইজোড়া বালা দিয়েছি, তবুও আমার দুঃখ হলো নানার দেয়া শেষ স্মৃতিচিহ্ন তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি, যা ছিল তোমার কাছে অমূল্য সম্পদ।

মোড়লদের মোড়লগিরি এখন আর নাই। মাঝে মাঝে লোকমুখে শুনি, মোড়লবাড়ির লোকজন সব সময় তোমার কাছে পড়ে থাকে কিছু ভাত কাপড়ের জন্য। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদেরকে না দিতে পারলে তোমার শান্তি হয় না। তাদেরকে খাবার না খাওয়ালে তোমার খাওয়া হয় না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, তাদের দেয়া আঘাতের চিহ্ন তোমার শরীর থেকে না মুছলেও তোমার মন থেকে চিরতরে মুছে গেছে। আর মুছবেই বা না কেন, তুমি যে 'মা'। তোমার চরণতলে আল্লাহর বেহেশত। সারাজীবন তোমাকে ভালোবেসে, তোমার সেবা করে, তোমার চরণতলে মরে যেতে চাই– মা আমার।

বনফুল

মৌসুমী আক্তার
অপারেটর, সুইং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

নীল আসমান, সবুজ পৃথিবী। সব সুন্দর করে তৈরি করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহ তা'য়ালার সকল সৃষ্টির মধ্যে একটি হলো ফুল– যার নামেই লুকিয়ে থাকে ভালোলাগা আর ভালোবাসা, যার রূপ সৌন্দর্য মুগ্ধ করে সবাইকে। পাষাণের মুখেও যে হাসি ফোটায় তার নাম ফুল। নানা রঙ আর রূপের এই ফুল। নানান নামে আমরা তাকে ডাকি। আমরা অনেকেই শখ করে ফুল গাছ চাষ করি। সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে নানা রঙের ফুল দিয়ে সাজাই আমাদের ঘর। অনেক যত্ন করে ফুল গাছ লাগিয়ে যখন ফুল ফোটে তখন বাগান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে টবে সাজাই, মালা গাঁথি, পূজা দেই। রাস্তার ধারে ফোটে নাম না জানা আরও অনেক ফুল, যা প্রকৃতির শোভা বর্ধন করে। অথচ এই ফুল শুকিয়ে গেলে আমরা তাকে ফেলে দেই নর্দমায়। তার স্থান হয় ময়লার স্তুপে। রাস্তার ধারে ফুটে থাকা ফুলগুলোকে পায়ের নিচে দলিত করি আমরা। ফুলের সৌন্দর্যে আমাদের ভালোলাগা তৈরি হলেও শুকিয়ে যাওয়ার পর তাকে একবারও ভালোলাগার চোখে আর দেখি না। তখন নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয় ফুলের। কোনো না কোনোভাবে ফুলের সাথে আশ্চর্য একটা মিল আছে মেয়েদের। ছোটবেলায় বাবা-মা, ভাই-বোনের আদরের দুলালি আমরা। সাধ্যমতো ভালোবাসা দেয় তারা আমাদের। সবার এক কপাল হয় না। কোনো মেয়ে বাবা অথবা ভাইয়ের ভালোবাসা কী তাও জানে না কোনোদিন।

আমরা অবহেলা নিয়ে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠতে থাকি। অনেক পাওয়া-না পাওয়া, অপূর্ণতা, হাজারো স্বপ্ন ধীরে ধীরে মাটিচাপা দিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মাঠে নামি। কেউ স্কুলে যাই, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমাদের বেশিরভাগেরই সংসারী হতে

হয়। কিন্তু সংসার করতে পারে কয়জন? আমরা মেয়ে মানুষেরা সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে যাই। তারপরও ভালো স্ত্রী, ভালো ছেলে-বউ কিংবা ভালো মা আমরা হতে পারি না। নিজের সব দিয়েও যখন কারো মন জয় করতে ব্যর্থ হই তখন নিজেকেই দোষ দেই– হয়তো আমারই কোনো সমস্যা। বাবার সংসারেও ঠাঁই হয় না অনেকেরই। তাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে গার্মেন্টস কারখানা। আমাদের মতো অনেক অসহায় মেয়েদের বেঁচে থাকার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল এই শিল্প। কিন্তু এখানে নানান দেশের নানান মানুষের ভিড়ে অনেকেই নিজেদের হারিয়ে ফেলে ভিন্ন জগতে। অনেকেই আমাদের ভালো চোখে দেখে না। গার্মেন্টসের শ্রমিকদের এখনো সমাজের ভদ্রলোকেরা ভালোভাবে গ্রহণ করে না। গার্মেন্টসে চাকরি করি জানলে একটু আড়চোখে তাকায়। গার্মেন্টসে চাকরি করা কোনো মেয়েকে শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের কেউ পছন্দ করলে অর্থাৎ বিয়ে করতে চাইলে সবাই তাকে নিন্দা জানায়। তার রুচি নিয়ে বিভিন্ন কথা বলে। আমরা নাকি রাস্তার মেয়ে। অনেক টাকার লোভ দেখায় অনেকেই। অনেক উচ্চপদবীধারী কর্মকর্তাগণ আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়। বড় বড় স্বপ্ন আর প্রলোভন দেখিয়ে ভালোবাসার সাগরে ভাসায়, দামি দামি উপহার দেয়। আমরা ভাবি– এই বুঝি জীবনে সুখ এল বলে। হায়রে! একবারের জন্যেও ভাবি না আমরাতো বনফুল– যা দূর থেকেই সুন্দর, যা কোনো মালির যত্নে গড়া বাগানের ফুল নয়। তাকে তুলে নিয়ে ঘরে সাজানো যায় না। মালা গেঁথে পূজা করা যায় না। যতদিন মন চাইবে আমাদের নিয়ে ঘুরবে ফিরবে, মজা নিবে, প্রাণ জুড়াবে। আর যখন মন ভরে যাবে, ছুঁড়ে ফেলে দেবে অজানা অচেনা অন্ধকার রাস্তায়। একটিবারের জন্যেও পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখবে না। তখন এই আমরা যারা সবকিছু হারিয়ে নিজের সম্মানটাও রক্ষা করতে পারি না, আমরা বেছে নেই অন্য এক অন্ধকার জগৎ, যেখান থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না। পুণরায় আবার অনেকেই মাথা তুলে দাঁড়ায়, অন্ধকার হাতড়ে আলোতে ফিরে আসে। বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্ন দেখে। আমরা বনফুল। কিন্তু আমরাও মানুষ, আমাদেরও অনেক স্বপ্ন থাকে। ভালোভাবে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। হয়তো সমাজ বদলাবে, বদলাবে সমাজের মানুষের ধারণা। গার্মেন্টস শ্রমিকেরা খারাপ নয়– এটা একদিন সবাই বুঝবে। মালির ফুলবাগানে হয়তো কোনোদিন আমাদেরও জায়গা হবে। আমরা ফুটতে চাই, সমাজে আমাদের ঘ্রাণ ছড়াতে চাই। গার্মেন্টসের মেয়ে নামে নয়, নিজ নামে পরিচিত হতে চাই।

সন্ধিলগ্ন

আন্না হাসান
অফিসার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

পথ বড় সংকীর্ণ, খুব কঠিন,
খুব ধুলি পড়ে গেছে স্মৃতিতে।
শুকনো পাতার আবরণে ঢেকে গেছে আমার আঙিনা।
বালির মায়াজালে আবদ্ধ আমার ফটোফ্রেম;
চারিদিকে কষ্টের জয়ধ্বনি–
করুণ কণ্ঠে কে যেন শুনিয়ে যাচ্ছে তার জীবনসন্ধি।
অনেক বলেছি...
বন্ধ করো তোমার এই কষ্টের বাণী।
আমি যে একমুঠো সুখ চেয়েছিলাম,
একটি রঙিন বসন্ত চেয়েছিলাম,
আর চেয়েছিলাম এক চিলতে অভিমান,
চেয়েছিলাম এক ঘর আলো আর ফুলের সুবাস।
খুব জানতে চেয়েছিলাম তার কাছে–
যখন থাকবে না তুমি কে দেখবে এই শিউলিতলা?
শুধু মুচকি হেসে চলে গেল সে।
সেই হাসির অর্থ আজও খুঁজে ফিরি,
কিন্তু পাইনি।
তবে তার সেই শিউলিতলা আজও
খুব অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক একইভাবে।

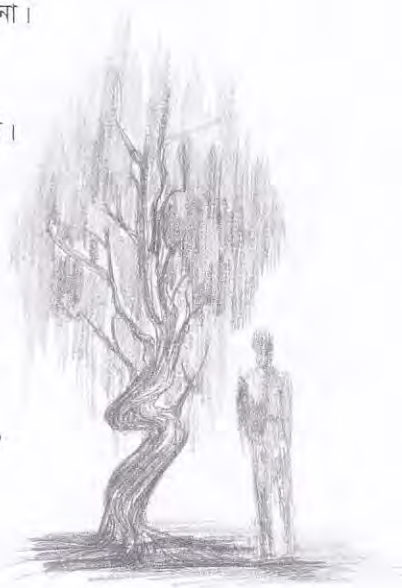

পায়রা নদী

মোঃ রিয়াজ হোসাইন
অফিস অ্যাটেনডেন্ট
ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিমিটেড

ঐ যে আমার পায়রা নদী
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
তীর জুড়ে যার মাঠের সবুজ
হৃদয় মনোহরা।

জলের ঢেউয়ে সকাল দুপুর
ঝিলিক মারে আলো,
বাদাম তুলে নৌকা চলে
দেখতে ভীষণ ভালো।

নদীর জলে সাঁতার কাটে
হরেক রকম মাছ,
তাদের সাথে খেলা করে
বক-সারস-হাঁস।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়
ভাটিয়ালি গানে,
পায়রা নদীর স্মৃতি
আমায় হাতছানিতে টানে।

সেসব কথা এখন আমার
মনে যদি পড়ে,
দু'টি ডানা থাকলে তবে
যেতাম কবে উড়ে।

উড়ে গিয়ে বসতাম আমি
পায়রা নদীর তীরে।
সোনাঝরা দিনগুলো সেই
আর কি পাব ফিরে!

বাসন্তী রঙের স্বপ্ন

খান সাজ্জাদ আল সাইখ
সিনিয়র ম্যানেজার, প্রোডাকশন প্লানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন
বাবিলন গ্রুপ

– অনি ভাই, অনিকেত মানে কী?
– অনিকেত মানে যার কোনো নিকেত নাই। এমনভাবে মাথা নাড়ালাম যেন আমি বুঝতে পেরেছি। আসলে কিছুই বুঝি নাই। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা নিকেত মানে কী?
– নিকেত মানে 'তোর মাথা,' গাধী কোথাকার, অনিকেত মানে যার কোনো থাকার জায়গা নাই, হোমলেস, বুঝেছিস!
– হোমলেস মানে কী? আমি দ্রুত জিজ্ঞেস করলাম।
– হোমলেস মানে--- তুই থামবি, দেখি তোর খাতাটা দে। লিখা শেষ হয়েছে?
আমি ভয়ে ভয়ে খাতাটা দিলাম। আমার লেখা পুরোপুরি শেষ হয়নি, মাথা নিচু করে কলম মুখে নিয়ে চিবোতে লাগলাম।
– কলম মুখে নিয়ে রাখতে কি ভালো লাগে? তোকে এতবার বলার পরও এই অভ্যাসটা ছাড়তে পারিস না কেন? আমি মুখ থেকে কলমটা বের করে নিলাম। এটা আমার একটা বাজে অভ্যাস হয়েছে। নিজের অজান্তেই কলম মুখে নিয়ে চিবোতে থাকি।

– তেরোর নামতা বলতো।
কী বললো ঠিক বুঝতে পারলাম না। অনুমান করে আমি বারোর নামতা বলতে শুরু করলাম।
– ১২X১ = ১২, ১২X২ = ২৪, ---
– আমি তোকে তেরোর নামতা বলতে বলেছি, তুই দেখি বারোর নামতা বলছিস!
আমি সাথে সাথে তেরোর নামতা বলতে শুরু করলাম। আমার বুক কাঁপতে লাগল।
– ১৩X১ = ১৩, ১৩X২ = ২৬, ১৩X৩ = ৪২
– তোকে কি আমি ১৩X৩ = ৪২ শিখিয়েছি? তুই খাতায়ও দেখি ৪২ লিখেছিস। তোর তো

পড়াশুনায় একেবারেই মনোযোগ নেই দেখছি। কানে ধরে একপায়ে দাঁড়িয়ে বল- ১৩X৩ = ৩৯। আমি চোখভরা জল নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

এটাই ছিল তোমার কাছ থেকে পাওয়া শেষ শাস্তি, আমি তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়ি। তোমার সাথে আমার যত স্মৃতি সব আমার ঠিক ঠিক মনে আছে। আমি জানি না এখন কেন এগুলো মনে আসছে। কিন্তু আমার ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছে। তোমার কি এগুলো মনে পড়ে অনি ভাই?

আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে। পুরো ঘটনাটা আমার চোখে ভাসছে। মনে হয় যেন এখনই ঘটছে। আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। আষাঢ়ের এক সন্ধ্যায় তুমি আমাকে সম্পাদ্য আঁকা শিখাচ্ছিলে, আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা ছিল। ঝড় আসবে আসবে ভাব। ঝড়ো হাওয়ায় আমার চুলগুলো উড়ছিল। আমি ঠিকমতো কম্পাস বসাতে পারছিলাম না। তুমি উঠে এসে কম্পাসসহ আমার হাত ধরে, আমার পিছনে কিছুটা ঝুঁকে চিত্রটা আঁকছিলে। তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ে এসে লাগছিল, আমার কেমন যেন একটা অনুভূতি হলো। সারা শরীরে এক ধরনের শিহরণ অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য কাচ ঝনঝন করে ভাঙছে আমার ভিতরে। আমি একপ্রকার জমে গেলাম। হাত নাড়াতে পারছিলাম না। তুমি চিত্র আঁকায় ব্যস্ত। বুঝতেই পারোনি সদ্য যৌবনে পা রাখা আমার মনের ভিতর কী হচ্ছে। ঐ রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। কেবলই ফিরে ফিরে ঘটনাটি আমার মনে আসছিল, একটু পর পরই আমি ঘাড়ে হাত রাখছিলাম আর কেঁপে উঠছিলাম।

আমার লেখাপড়া শুরু তোমার হাত ধরেই। আমার স্কুলে যাওয়া, স্কুল থেকে ফেরা সবই তোমার সাথে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ছুটির পর আমি স্কুল গেট থেকে বের হতেই দেখতাম তুমি দাঁড়িয়ে আছ। আমি দৌড়ে তোমার কোলে উঠে পড়তাম। ফেরার পথে আমি কত গল্প করতাম তোমার সাথে। অথচ আজকের মতো অদ্ভুত অনুভূতি আমার কখনোই হয়নি।

আমার বুকের ভিতর একটা চাপা কষ্ট অনুভূত হচ্ছিল, কান্নায় গলা ধরে আসছিল। এটাই কি প্রেমের অনুভূতি! আমি কি তোমার প্রেমে পড়ে গেলাম! পরদিন ভোর থেকেই আমি ভাবতে লাগলাম, কীভাবে আমার কথাগুলো তোমাকে বলব। তোমাকে বোঝানোর জন্য আমি যা যা করলাম, তা যদি তুমি জানতে তাহলে হাসিতে ফেটে পড়তে।

আমি বেশ একটা সাজগোজ করে তোমার আশেপাশে ঘুরতে লাগলাম। তোমার কোনো কিছু প্রয়োজন না হলেও এই যেমন পানি, চা এগুলো নিয়ে তোমার রুমে যেতে লাগলাম। এমনকি জ্যামিতি আঁকায় বার বার ভুল করতে লাগলাম এই আশায় যে, আরেকবার যদি তোমার স্পর্শ পাই।

আমি পাগল হয়ে গেলাম। রাতের পর রাত আমার কষ্টে কাটতে লাগল। তুমি রাত জেগে পড়তে। যতক্ষণ তোমার রুমে আলো জ্বলত আমি জেগে বসে থাকতাম। একরাতে তুমি পড়া শেষ করে শুয়ে পড়েছ, আমার চোখ দু'টো একটু লেগে এসেছে। আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম–

আমি, তুমি ও আমাদের মেয়ে বাসন্তী হাত ধরাধরি করে নদীর পাড় ধরে হাঁটছি। তোমার বাসন্তী রঙ পছন্দ বলে আমাদের মেয়ের নাম রেখেছ বাসন্তী। আমি আর আমাদের মেয়ে বাসন্তী একই রঙের শাড়ি পরে আছি। বাসন্তী রঙ। আমার কী যে আনন্দ হচ্ছিল, আমি যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

স্বপ্ন ভেঙে যেতেই আমার খুব লজ্জা করতে লাগল। আমাদের এখনও বিয়েই হয়নি আর আমি কিনা এরকম একটা স্বপ্ন দেখলাম। আশ্চর্য স্বপ্নে আমি তোমাকে অনিকেত বলে ডাকছি। তুমি একটা হলুদ পাঞ্জাবি পরে আছ। আমি হাত ইশারা করে তোমাকে কাছে আসতে বলছি।

সারাটাদিন আমি স্বপ্নের আবহের মধ্যেই ছিলাম। ভাবছিলাম তোমায় আমি কেন অনি ভাই বলে ডাকব। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই নও। তোমার বাবা আমার বাবার বন্ধু। সড়ক দুর্ঘটনায় তোমার মা-বাবা মারা যান। তোমাকে বাবা আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। আমি তখন ক্লাস টু-তে পড়ি। তুমি খুব সম্ভব ক্লাস এইটে। পড়াশুনায় ভালো ছিলে বলে বাবা আমাকে পড়ানোর ভার তোমাকে দিলেন।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম তোমাকে অনিকেত বলে ডাকব। তুমি বয়সে আমার মাত্র ছয় বছরের বড়। এটা কোনো বিষয় নয়। আমার ভাবতে ভালো লাগে, আমি তোমাকে অনিকেত বলে ডাকছি আর তুমি হেসে জবাব দিচ্ছ। তোমার হাসিটা কী যে সুন্দর অনি ভাই, আমার শুধু বার বার দেখতে ইচ্ছে হয়। হাসিটা যেন মুখ থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে চোখে ছড়িয়ে পড়ে এবং মমতায় রূপ নেয়। মমতাময়ী হাসি।

একদিন নদীর ধারে মেলায় যেতে চেয়েছিলাম। আমার খুব শখ ছিল মেলা থেকে লাল সবুজ চুড়ি কিনব। তুমি কিছুই বললে না। আমার খুব মন খারাপ হলো। সন্ধ্যায় তুমি ডাক দিলে- মিমু ঘরে কুপিটা দিয়ে যা। আমি কুপিটা টেবিলের উপর রেখে ফিরে আসছিলাম। তুমি আবার ডাকলে। আমি অভিমান করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তুমি সামনে এসে আমার হাতে লাল সবুজ এক বক্স চুড়ি দিলে। আমি এতই অভিভূত হলাম যে, কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। এক ধরনের ভালোবাসা মিশ্রিত লজ্জা আমাকে গ্রাস করতে লাগল। আমি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঘর থেকে বেরিয়েই আমি মা'র মুখোমুখি হয়ে গেলাম। মা বোধ হয় কিছু আঁচ করতে পেরেছে। আমি চুড়ির বক্সটা লুকিয়ে ফেলার একটা ব্যর্থ

চেষ্টা করলাম। মা আমার হাত ধরে ফেললেন। এক প্রকার টেনে হিঁচড়ে আমাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। যার কোনো সোজাসাপটা উত্তর আমি দিতে পারছিলাম না। প্রথমে বানিয়ে একটা কিছু বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু ধোপে টিকল না। তারপর ঠিক করলাম– আমি সোজাসুজি মাকে সব বলব।

আমি অনি ভাইকে ভালোবাসি। আমার বলার মধ্যে বোধ হয় কিছু একটা ছিল। অনেকটা নিরুত্তাপ কণ্ঠে আমি কথাগুলো বলি, মা প্রথমে বুঝতেই পারেনি।
কী বললি?
আমি চুপ করে রইলাম।
কিছুক্ষণ পর আমি গালে একটা চড় অনুভব করলাম। মা বোধ হয় তার সর্বশক্তি দিয়ে চড় বসিয়েছিলেন। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। চুড়ির বাক্সটা হাত থেকে পড়ে ঝনঝন শব্দে পুরো ঘরে ছড়িয়ে গেল। আমি প্রথমে ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে গেলাম। তারপর কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করে ভাঙা চুড়িগুলো মেঝে থেকে কুড়াতে লাগলাম। মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

মনে হচ্ছিল খুব একটা খারাপ সময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মা কখনোই কোনো কথা বা ঘটনা তার নিজের মধ্যে রাখতে পারে না। ফলে যা হলো, ঐদিন রাতেই বাবা খাওয়ার টেবিলে আমাকে শাসালেন। তোমার সাথে দেখা করা বা কথা বলা আমার জন্য নিষিদ্ধ। এমনকি আমার পড়াশুনাও বন্ধ করে দেয়া হলো। বাবা ঘোষণা দিলেন ফের যদি তার নিষেধ অমান্য করি এর ফল হবে ভয়াবহ। আমি মাথা নিচু করে খাওয়া শেষ করলাম, আমার বাবা খুব একটা সহজ লোক নন। আমার মনে হচ্ছিল খুব একটা ভয়ানক কিছু হতে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা যে কী তা বুঝতে পারছিলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল যে তোমার হয়তো খারাপ কিছু একটা হবে। বাবা এত সহজে ছাড়বেন না।

প্রায় সাত দিন পার হয়ে গেল। তোমার সাথে আমার দেখা নেই। তোমার কথা শুনতে পাই না। তেমার মায়াময় হাসি দেখি না। কী যে কষ্টে আমার দিন কাটছিল তোমাকে বুঝাতে পারব না। এক সন্ধ্যায় আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। একটা অমোঘ আকর্ষণে তোমার কাছে ছুটে গেলাম। তুমি পড়ার টেবিলে বসেছিলে। অবিশ্বাস ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে। আমি পাশে বসে তোমার হাতটা ধরলাম। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে অনি ভাই?

তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে মায়াভরা কণ্ঠে ফিস ফিস করে বললে, আমি সব জানি মিমু। এটাই ছিল তোমার কাছ থেকে শোনা শেষ কথা। উহ্! আমি আর ভাবতে পারছি না। প্রায় এক ঘন্টা হতে চলল, আমি ঘরের সিলিং এ ঝুলে আছি। স্মৃতিগুলো সব একে একে চোখের সামনে ভাসছিল। এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে আসছে। চারদিক আবছা নীল

আলোয় ঢেকে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমি অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি।

যেখানে তুমি নেই, সেখানে আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমি হেরে গেছি অনি ভাই।

সব স্মৃতি মুছে যেতে যেতে আমি দ্বিতীয়বারের মতো উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করলাম আমার ঘাড়ে। আমি ঠিক আগের মতোই শিহরিত হলাম। মনে হলো যেন ক্ষীণ কণ্ঠে কেউ আমাকে বলছে-

মিমু আমি তোকে নিতে এসেছি।

একজন সাদাকালো মানুষ ও কিছু রঙিন স্বপ্ন

আরিফ হোসেন
সিনিয়র অফিসার, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট
ব্যাবিলন গ্রুপ

সকালে অফিসে ঢুকতেই বস সুমনকে তার রুমে ডাকেন। সুমন রুমে এলে তার গত মাসের হাজিরার রেকর্ডটি সুমনের হাতে ধরিয়ে দেন বস। সুমন দেখতে পায়, গত মাসে সে মোট সাত দিন বিলম্বে কর্মস্থলে উপস্থিত হয়েছিল এবং মোট অনুপস্থিত ছিল তিন দিন। সুমন বলতে শুরু করল– আমার মায়ের অসুস্থতা...।
বস সুমনকে থামিয়ে দিলেন।
আমি জানি আপনি কী বলবেন।
আপনার মায়ের অসুস্থতার কারণে কোম্পানি আপনাকে এক দিন, দু'দিন কনসিডার করতে পারে কিন্তু সাত দিন নয়। তার উপর তিন দিন অনুপস্থিত ছিলেন। এখন আবার এ মাসের পুরো টাকাটাও অগ্রিম চেয়েছেন। এ কোম্পানি কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। আপনার যদি পরিবারের এতই সমস্যা থাকে, আপনি বরং পরিবারেই সময় দিন। বস এইচআরকে ডেকে বললেন– সুমন সাহেবের যা পাওনা আছে দিয়ে দিন। কাল থেকে সুমন সাহেব আসবেন না।

সুমন চুপচাপ সব শোনে, কোনো কথা বলে না। অতিরিক্ত রাগ, অভিমান হলে সে কোনো কথা বলতে পারে না, চুপ করে থাকে।

সকাল এগারোটা। এ সময়টাতে সাধারণত রাস্তাঘাট কিছুটা ফাঁকা থাকার কথা থাকলেও আজ তার ব্যতিক্রম। সুমন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কোনো বাসেই সিট খালি নাই, দাঁড়ানোর জায়গাটুকু পর্যন্ত নাই। তার উপর সূর্যটা আজ যেন একটু বেশিই উদার। তার সমস্ত উষ্ণতা অকৃত্রিমভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে, পুরো পৃথিবীটাকে যেন পুড়িয়ে ছাড়বে। সূর্যের দাপটে কেবলই ঘামছে সুমন। ঘামে ভেজা শার্ট শরীরের সাথে লেপ্টে রয়েছে। শার্ট গায়ের সাথে লেপ্টে থাকলে ভীষণ অস্বস্তি লাগে সুমনের। এই মুহূর্তে চাইলেও সে শার্ট খুলে ফেলতে পারবে না। জুতা-মোজা পরিহিত একজন লোককে খালি গায়ে দেখতে মোটেও স্বাভাবিক মনে হবে না। লোকজন আড়চোখে তাকাবে। কেউ আড়চোখে তাকালে আরো

বেশি অস্বস্তি লাগে সুমনের।

সুমনের হাতে এখন অফুরন্ত সময়। বসের নির্দেশমতো কোনোরকম প্রতিবাদ কিংবা আবদার না করেই সুমন অফিস থেকে বের হয়ে আসে। বাসের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছিল– আজ সকালটা কত সুন্দর ছিল! হালকা ঠান্ডা কোমল বাতাস, আকাশে সাদা মেঘ ভেলার মতো ভাসছিল, সূর্যের হালকা উষ্ণ ও কোমল আলোয় আলোকিত হয়েছিল পুরো ধরিত্রি। গোলাপ গাছের গোলাপের মিষ্টি সুবাস বারান্দা ছাড়িয়ে পুরো বাড়িটাকে এক স্নিগ্ধ, মিষ্টি ও পবিত্র সৌরভে ভরিয়ে দিচ্ছিল যেন। কী চমৎকার একটা সকাল! একটা দিনের শুরু। সকালটা দেখে মনে হচ্ছিল আজ দিনটি খুব চমৎকার কাটবে সুমনের। আসলে দিনের শুরুটা দেখে বুঝা যায় না দিনের বাকি সময়টুকু কেমন কাটবে। কিছুক্ষণ আগে সুমনের সাথে ঘটা অমানবিকতায় সব এলোমেলো হয়ে গেল। ঘটনাটি মনে মনে ভাবতেই একটা চাপা আর্তনাদ সুমনের বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। পরিচিত কর্মপরিবেশ, কলিগদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে। কোম্পানির প্রতি, কাজের প্রতি, কলিগদের প্রতি একটা অদৃশ্য মায়া তৈরি হয়েছিল গত ছয় মাসের ছোট্ট এই সময়টাতে। দিনের বেশিরভাগ সময়তো অফিসেই কাটাত সুমন। আজ তার অবসান হয়ে গেল। সব বিচ্ছেদেই কিছু নীরব, চাপা কষ্ট থাকে যা এই মুহূর্তে সুমন অনুভব করতে পারছে।

এখন কোথায় যাবে সুমন, তাই মনে মনে ভাবছিল। বাসায় চলে যাবে নাকি অন্য কোথাও যাবে। সুমনের তেমন বিশেষ কোনো বন্ধু নেই। একটা কথা কোথায় যেন পড়েছে সুমন, এ মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছে না। কথাটি এরকম– কারো সাথে যদি সাত বছর পর্যন্ত রিলেশন থাকে তবে সে রিলেশন সহজে নষ্ট হয় না। স্কুল জীবনের তিনজন বন্ধু আছে সুমনের যাদের সাথে তার প্রায় দুই যুগের মতো সম্পর্ক। তাদের কারো সাথে দেখা করা যেতে পারে। এ মুহূর্তে বাসায় যাওয়া যাবে না। বাসায় গেলেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করবে–কী হয়েছে? শরীর খারাপ কিনা, কেন চলে এসেছ এমন হাজারো প্রশ্ন।

এসব ভাবতে ভাবতে রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকান দেখে সুমন। গরুর খাঁটি দুধের চা। এই মুহূর্তে গরুর খাঁটি দুধের এক কাপ চা মন্দ হবে না। চায়ের কাপে চুমুকের সাথে সাথে টেনশনও কমে যাবে, এ আশায় দোকানে গিয়ে বসে সুমন। পাশের ভদ্রলোকের সিগারেটের ধোঁয়ায় সুমনের চা পানে বেশ অস্বস্তি লাগে। সিগারেটের গন্ধটা সহ্য করতে পারে না সুমন। তাই একটু সরে গিয়ে দোকানদারের কাছাকাছি বসে ও। একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত লাগে সুমনের। একজন ধূমপায়ী লোক বাজার করতে গেলে খুব দেখে শুনে ফরমালিন/ বিষ ছাড়া সবজি, মাছ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে। অথচ জেনেশুনে, স্বজ্ঞানে চড়াদামে নিজে নিকোটিন/ বিষ কিনে খায়। কী অদ্ভুত ব্যাপার!

চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে মোবাইলে মনোযোগ দেয় সুমন। নাম্বার তালিকা ঘাটতেই বন্ধু শরিফের নাম্বার দেখতে পেয়ে ফোন দেয় সুমন...

হ্যালো... শরিফ, কেমন আছ? আমি সুমন। চিনতে পেরেছ?

কোন সুমন? এ নামে তো কাউকে চিনি না। আপনি কোথা থেকে বলছেন?

সুমন কথা না বাড়িয়ে ফোন কেটে দেয়। মনে মনে ভাবে হয়তো নাম্বারটি সেভ করতে ভুল হয়েছিল। আজ সবকিছু এমন এলোমেলো কেন?

শরিফের ফোন থেকে কল আসে সুমনের মোবাইলে। একটু ইতস্তত করে কল রিসিভ করে সুমন।

হ্যালো... আপনি কেটে দিলেন কেন?

আমি হয়তো ভুল নাম্বারে ফোন করেছিলাম। খিলক্ষেতে শরিফ নামে আমার এক স্কুল জীবনের বন্ধু ছিল। আমি তার নাম্বারে কল দিতে গিয়ে হয়তো আপনার নাম্বারে চলে গেছে। দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আমি রাখছি।

আরে সুমন আমিই তো শরিফ, একটু মজা করছিলাম। তুই তো বহুদিন পর ফোন দিলি। প্রায় এক বছর তো হবেই। তুই কোথায় এখন?

আমি শ্যামলী।

শ্যামলী! আরে তুইতো আমার খুব কাছেই আছিস। যদি ফ্রি থাকিস তবে চলে আয় আমার অফিসে। ২-বি/১, দারুস সালাম রোড, মিরপুর। ব্যাবিলন গ্রুপ। রিসিপশনে অপেক্ষা করিস। আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি বের হব। স্যারের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি। হাসপাতালে যেতে হবে।

হাসপাতাল কেন, তোর অসুখ নাকি?

না, আমার অসুখ না, বাবা অসুস্থ। তুই চলে আয় সব পরে বলছি।

শরিফের অফিসের রিসিপশনে বসে আছে সুমন। 'ব্যাবিলন কথকতা' নামে একটি বই দেখে হাতে নেয় সুমন। বই পড়া সুমনের একটি পুরোনো অভ্যাস ও প্রিয় শখগুলোর মধ্যে একটি। পড়তে শুরু করে সুমন। শুভেচ্ছা বাণী পড়ে কৌতূহল বাড়ে সুমনের। সূচীপত্র দেখে 'অবিশ্বাসের পাথরে খোদাই যেন সে চোখ' গল্পটি পড়ার জন্য পৃষ্ঠা উল্টায় সুমন।

এ সময় শরিফের কল আসে সুমনের মোবাইলে।

সুমন, দুঃখিত। আমার একটু দেরি হবে। তোর যদি খুব বেশি তাড়া থাকে তবে চলে যেতে পারিস।

না না, আমার আজ কোনো তাড়া নেই। অফিস থেকে একেবারে বের হয়ে এসেছি। আমি তোদের 'ব্যাবিলন কথকতা' বইটি পড়ছি। তুই কাজ সেরে আয়। সুমন আবার গল্পে মনোযোগ দেয়।

গল্পটা একুশ বছর আগের... লেখক চমৎকারভাবে গল্পের শুরু করেছেন, পাঠক শেষ না

করে উঠতেই পারবে না। গল্পের মাঝে হারিয়ে যায় সুমন। আবার মোবাইলে কল আসে তার। সুমন মোবাইলটি সাইলেন্ট করে রাখে। তার সমস্ত মনোযোগ এখন গল্পটির দিকে। গল্পটি পড়ে শেষ না করতেই শরিফ চলে আসে সুমনের কাছে। সুমন গল্পটি শেষ করে উঠতে চায়। শরিফ তাকে গল্পের বইটির একটি কপি উপহার দেয় এবং পরে পড়ার জন্য অনুরোধ করে। বইটি পেয়ে সুমন খুব খুশি হয়। আজ তার সাথে ঘটা সকল খারাপের মাঝে এই একটাই ভালো ব্যাপার ঘটল।

সুমন শরিফের সাথে বাসে ওঠে। গন্তব্য জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল। সুমনকে তার বাবার অসুস্থতা সম্পর্কে জানায় শরিফ। গত মাসে তার বাবার হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। গত তিন দিন সে অফিসে আসতে পারেনি। আজ জরুরি কাজে এসেছিল এবং দুই ঘন্টা আগেই চলে যাচ্ছে। সুমন অবাক হয়ে বলে– এমন করলে তো চাকরিই চলে যাবে তোর। সুমনকে আশ্বস্ত করে শরিফ। না না, আমার সব স্যার অনেক ভালো। বিপদে পড়লে তাঁরা সবরকম সাহায্য সহযোগিতা করেন। বাবার চিকিৎসার জন্য ছুটির পাশাপাশি অফিস থেকে আমাকে বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তাও করেছেন। সুমন বেশ অবাক হয়। তার প্রাক্তন কোম্পানির সাথে এই কোম্পানির তুলনা করে মনে মনে বেশ লজ্জিত হয় সুমন। ব্যাগ থেকে বইটি বের করে আবার তাকায় সুমন। 'ব্যাবিলন কথকতা' বইয়ের নামটিও ব্যতিক্রম। শরিফের কোম্পানির প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা ও ভালোলাগাবোধ জাগ্রত হয় সুমনের মনে।

পোশাকশিল্প সম্পর্কে সুমন এতদিন নানা নেতিবাচক কথা শুনেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র মুনাফার কথা না ভেবে যে কোম্পানির মালিকগণ সংস্কৃতমনা, কর্মীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের জন্য কর্মীদেরই লেখার মাধ্যমে কোম্পানির খরচে যারা ম্যাগাজিন বের করতে পারেন তারা তো মহান মানুষই হবেন। শরিফকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হয় তার আর নিজেকে...। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে সুমনের।

আগামীকাল সুমনের ইন্টারভিউ। বন্ধু শরিফের মাধ্যমে ব্যাবিলন গ্রুপের একটি শূন্য পদের জন্য জীবন-বৃত্তান্ত জমা দিয়েছিল সুমন। এইচআর থেকে শাহেদ নামে এক ভদ্রলোক সুমনকে আগামীকাল ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে অবগত করেন। ইতোমধ্যে বন্ধু শরিফের মাধ্যমে ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয়েছে সুমন। কোম্পানিটি শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারেও সমান সজাগ। ব্যাপারটি বেশ ভালো লাগে সুমনের। সুমন তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আগামীকালের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য।

সুমন ইন্টারভিউয়ের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছিল বইয়ের মাঝে চোখ রেখে। রাতের নীরবতা ভাঙে দেয়াল ঘড়িটার টুং টাং শব্দে, ঘড়িটা জানান দিচ্ছে এখন রাত বারোটা। এখনই

ঘুমিয়ে পড়া প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ঘুম পরবর্তী দিনের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রুমের আলোটা নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করে সুমন এবং এক সময় ঘুমিয়েও পড়ে। অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখে মাঝরাতে জেগে ওঠে। স্বপ্নটা মনে করার চেষ্টা করে সুমন। খুব জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত কোথাও যাচ্ছিল সে। যে রাস্তাটি দিয়ে সুমন হাঁটছিল সেখানে কিছু পুলিশ সুমনের দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হাসছিল। কী বাজে স্বপ্ন, নাকি দুঃস্বপ্ন! মোবাইল স্ক্রিনে দেখতে পায় এখন রাত প্রায় আড়াইটা। চারপাশ অদ্ভুত নীরব, নিস্তব্ধ। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সুমন। শান্ত ঝিরিঝিরি বাতাস আর চাঁদের হালকা আলোয় রাতের এ মুহূর্তটাকে খুব ভালো লাগছে সুমনের। রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার পাতাগুলো হালকা দুলছে। রাঙা কৃষ্ণচূড়ার দুলুনি দেখে হৃদয় যেন পাখি হয়ে উড়ে বসতে চাইছে কৃষ্ণচূড়ার ডালে। রাতের এমন স্নিগ্ধ, শান্ত সৌন্দর্যে কিছুক্ষণ পূর্বের বাজে স্বপ্নগুলো এখন অনেকটাই ফ্যাকাশে। রাস্তার পাশের ল্যাম্পপোস্টের নিয়ন আলোটা হঠাৎ নিভে যায়। লোডশেডিং ঢাকা শহরের নিত্য সমস্যা। অসহ্য গরমে এখন সহজে আর ঘুম আসবে না।

সকাল দশটায় সুমনের ইন্টারভিউ, প্রস্তুতি মোটামুটি ভালোই হয়েছে। কুড়িল বিশ্বরোড থেকে মিরপুর। গন্তব্য খুব বেশি দূর নয়। একটি সুন্দর পরিবেশে নতুনভাবে শুরুর প্রত্যাশায় সুমন রওনা হয় মিরপুর অভিমুখে। সাদা মনের মানুষ সুমন প্রজাপতি নামক গাড়িতে চড়ে প্রজাপতির ডানার মতো কিছু রঙিন স্বপ্ন বুকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যায় গন্তব্যের দিকে। সুমনের পাশের সিটে বসা ভদ্রলোক পত্রিকা পড়ছিলেন। পত্রিকাভর্তি কেবল বন্যার সংবাদ। এবার দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যায় মানুষের জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পত্রিকায় ব্যাবিলন গ্রুপের পক্ষ থেকে বন্যায় ত্রাণ দেয়ার সংবাদ দেখে সুমনের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভাইয়া একটু দেখি বলে লোকটির হাত থেকে একপ্রকার টান দিয়েই পত্রিকা নিয়ে কিছুটা উচ্চ শব্দে বলে ওঠে– বন্যার্ত মানুষদের পাশে ব্যাবিলন। পাশের সিটে বসা লোকটি সুমনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পথিমধ্যে পুলিশ গাড়িটি থামায় চেকিংয়ের জন্য। সব সিটগুলো চেক করে তারা। সুমনের সিটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় একজন, নাম জিজ্ঞেস করে। একপর্যায়ে সুমনের পকেটের ভিতর হাত দিয়ে ছোট্ট একটি প্যাকেট বের করে আনে একজন পুলিশ সদস্য। প্যাকেটের ভিতর সাদা পাউডারের মতো কিছু। কলার ধরে সিট থেকে টেনে উঠায় সুমনকে। পুলিশ সদস্য তার বসকে জানায়– স্যার হেরোইন পেয়েছি এর পকেটে। সুমনকে জোর করে বাস থেকে টেনে নামায় পুলিশ। তার হাতের পত্রিকাটি পড়ে যায়, ব্যাবিলন গ্রুপের বন্যায় ত্রাণ দেয়ার দৃশ্যটি পড়ে থাকে গাড়ির মেঝেতে।

সুমন চিৎকার করে বলতে থাকে– এটা আমার না, বিশ্বাস করুন এটা আমার না।

তোর না হলে পকেটে কীভাবে এল?
কীভাবে এল আমি বুঝতে পারছি না। এটা আমার না।
থানায় চল সব বুঝতে পারবি।
সুমনকে টেনে বাস থেকে নামায় তারা।
একটি চায়ের দোকানের পেছনে খোলা মাঠে নিয়ে যায় সুমনকে। পুলিশের পোশাক খুলে ফেলে সবাই। সুমনকে বলে– তোর ব্যাগের মধ্যে কী আছে বের কর।
সুমন বলে আমি একটি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি, ব্যাগে কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। টাকা-পয়সা কী আছে বের কর।
শার্টের পকেটে পঞ্চাশ-ষাট টাকা আছে। আর প্যান্টের পকেটে নতুন বিশ টাকার নোটের একটি বান্ডিল আছে।
সুমনের প্যান্টের পকেট থেকে জোর করে সেই বান্ডিলটি বের করে নেয় তারা।
ব্যাংকের কার্ড বের কর।
আমার কোনো ব্যাংক কার্ড নেই।
দেখে তো মনে হয় বড় সাহেব। আর বলছিস কোনো কার্ড নেই। তাড়াতাড়ি বের কর।
বিশ্বাস করুন আমি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি আমার কাছে এসব কিছু নেই।
এত রিস্ক নিয়ে তোকে ধরে তো আমাদের কোনো লাভ হলো না। একজন সজোরে সুমনের পেটে ঘুষি মারে। সুমন ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। মন দিয়ে শোন, তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, ডানে বামে কোনোদিকে তাকাবি না। সোজা হাঁটবি, দ্রুত। যদি ডানে বামে তাকাস তবে ধরে এনে মাটিতে পুঁতে রাখব।
সুমন কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে যায়।

ব্যাবিলন গ্রুপের রিসিপশনে বসে আছে সুমন। মানসিকভাবে কিছুটা বিধ্বস্ত সে। ভাবছে ইন্টারভিউ দিবে নাকি চলে যাবে, এ অবস্থায় ইন্টারভিউ দিতে পারবে কিনা। শরিফকে ফোন দিবে কিনা ইত্যাদি ভাবছে সুমন। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা বার বার মনে পড়ছে তার। নিয়তি কেন তার সাথে এমন খেলা খেলছে। ইন্টারভিউয়ের ডাক পড়ে সুমনের। মনকে শক্ত করে ইন্টারভিউ দিতে যায় সুমন। ইন্টারভিউ রুমের দরজা খুলে যেন আকাশ থেকে পড়ে সুমন। নির্বাক তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ ইন্টারভিউ বোর্ডের একজন স্যারের দিকে। পরক্ষণেই রুম থেকে বের হয়ে আসে সে। কাউকে কিছু না বলে সোজা নিচে নেমে যায়। পেছন থেকে কেউ ডাকে তাকে। সুমন হাঁটতে থাকে। নিয়তি যেন তার সাথে নির্মম খেলায় মগ্ন। ইন্টারভিউ বোর্ডে বসা স্যার আর বাসে তার সাথে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনার স্বাক্ষী পাশের সিটে বসা ভদ্রলোক কীভাবে একই ব্যক্তি হয়ে গেলেন!

সুমন হাঁটছে। সেদিনের মতো আজও মাথার উপর উত্তপ্ত সূর্য। সূর্যের তেজ আজ যেন আরো বেশি। মনে হচ্ছে আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সুমন। স্মৃতিতে একের পর এক

ঘটে যাওয়া ঘটনার রিপ্লে হচ্ছে– চাকরি চলে যাওয়া, বাসের মধ্যে মিথ্যে পুলিশের বেশে কিছু লোকের ভণ্ডামি, ইন্টারভিউ বোর্ডের স্যার ও বাসে পাশের সিটে বসা লোকের একই ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ! মাথার ওপরে বিশাল আকাশ, নিচে সূর্যের তাপে পৃথিবীর উত্তপ্ত পিচঢালা পথ। সুমন হাঁটছে ধীরপায়ে, কিছুটা এলোমেলো। এ অনিশ্চিত পথচলার শেষ কোথায়? স্মৃতির মনিকোঠায় তিলে তিলে জমানো রঙিন স্বপ্নগুলোর সমস্ত নির্যাস শুষে নিয়ে যেন চৈত্রের ফাটা মাঠের মতো চৌচির করে দিচ্ছে সূর্যের তেজ। সেদিন সুমনের স্বপ্নে দেখা পুলিশের বিশ্রী হাসি আর আজকের উত্তপ্ত সূর্যটাকে যেন একইরকম মনে হচ্ছে। প্রকৃতিও যেন বিদ্রুপ করছে সুমনের সাথে। একটি সুন্দর পরিবেশে, নতুন উদ্দীপনায় এক চমৎকার শুরুর প্রত্যাশা ও মনের মাঝে গড়ে ওঠা হাজারো রঙিন স্বপ্নগুলো এখন যেন কেমন ফ্যাকাশে আর ধূসর মনে হচ্ছে সুমনের...

পাবনা মানসিক হাসপাতালে একদিন

উম্মে সালমা ডালিয়া
ম্যানেজার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু না কিছু অপূর্ণতা থেকেই যায়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু স্বপ্ন থাকে, যা সবার জীবনে সফলভাবে ধরা দেয় না। আবার কারো কারোর জীবন এত কষ্টে ভরা থাকে যেটা জানলে আমাদের সবারই খুব কষ্ট হয়। এমন-ই একটি ঘটনার কথা আজ আমি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চাই। গত মাসে আমার সেকশনের একজন ছেলে চাকুরিতে ইস্তফার কাগজ জমা দিতে এলে আমি কারণ জানতে চাইলাম। জবাবে সে বলল যে, তার মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাই মাকে দেখাশোনা করার জন্য তাকে গ্রামে চলে যেতে হবে। সে-ই একমাত্র সন্তান তার মায়ের। একথা শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমার কিছু স্মৃতি আছে মানসিক ভারসাম্যহীনদের নিয়ে।

বেশ কয়েক বছর আগে আমার সুযোগ হয়েছিল পাবনা মানসিক হাসপাতাল ভিজিট করার। যখন পাবনা মানসিক হাসপাতাল তৈরি হয় তখন এটাই ছিল আমাদের দেশের একমাত্র মানসিক হাসপাতাল। পাবনা শহর থেকে আনুমানিক আট কিলোমিটার দূরে হেমায়েতপুরে এর অবস্থান। পাবনা জেলার তদানিন্তন সিভিল সার্জনের উদ্যোগে প্রথমে স্থানীয় এক জমিদার বাড়িতে ১৯৫৭ সালে শুরু হয়েছিল এর যাত্রা। পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালে এটা হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হয়। প্রায় ১১৮ একর জায়গা নিয়ে এই হাসপাতাল নির্মিত হয়। একদম শুরুতে ৬০টা বেড নিয়ে এর যাত্রা শুরু। এরপর ধাপে ধাপে এর বেড সংখ্যা বাড়ানো হয়। বর্তমানে ৪০০ বেড রয়েছে এই হাসপাতালে। ২৮০টা বেড হচ্ছে ফ্রি বেড, ১২০টা বেড হচ্ছে পেয়িং বেড। এতে ১৮টা ওয়ার্ড আছে- ১৩টা ছেলেদের আর ৫টা মেয়েদের জন্য।

যাহোক, মূল কথায় আসি। আমরা অনেকে মিলে খুব আগ্রহ নিয়ে গেলাম মেন্টাল হাসপাতালে, কেমন আছে মানসিক রোগীরা তাই দেখতে। এই হাসপাতালে যে কেউ ইচ্ছা করলেই ঢুকতে পারে না, তবে ভিতরে ঢোকার বিশেষ অনুমতি ছিল আমাদের। প্রথমে অফিসে ঢুকে আমরা অনুমতি নিয়ে ২টা গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ ছেলেদের ওয়ার্ডে শুধুই ছেলেরা এবং মেয়েদের ওয়ার্ডে শুধু মেয়েরাই যেতে পারবে। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি কেন এই নিয়ম। যাহোক, করিডোর ধরে যখন আমরা যাচ্ছিলাম মেইন ওয়ার্ডের দিকে তখন দেখলাম খাবারের বড় বড় ডেকচি নিয়ে হল্লা করে কিছু লোক আমাদের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ওদের আচরণ একটু অদ্ভুত লাগল আমার। হাসপাতালের স্টাফদের থেকে জানতে পারলাম এরাও মানসিক রোগী কিন্তু কিছুটা সুস্থ, তাই ওদেরকে দিয়ে নানা ধরনের কাজ করায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এখানে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলাম, এটা সরকারি হাসপাতাল। চারিদিকে দৈন্যদশা বিদ্যমান, বিল্ডিংয়ের অবস্থাও তথৈবচ। চলতি পথে হঠাৎ শুনতে পেলাম আমাদের বেয়াইন সম্বোধন করে পাশের বিল্ডিং থেকে কয়েকজন ছেলে রোগী ডাকছে। একজন আবার ভীষণ মিনতি করে একটা সিগারেট চাচ্ছিল। এদের বয়স ২০ থেকে ২৮ এর মধ্যে হবে। আমার এত খারাপ লাগছিল যে তা লিখে বোঝানো যাবে না। আমরা মেয়েরা এগিয়ে গেলাম মেয়েদের ওয়ার্ডের দিকে।

এখানেও ভাগ রয়েছে রোগীদের। মানসিক অবস্থার তারতম্যভেদে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। প্রথমে গেলাম অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীদের ওয়ার্ডে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সবাইকে। এদের দেখে বুঝাই যাচ্ছিল না যে তারা মানসিক রোগী। ওখানে সামিনা নামে এক রোগীর সাথে কথা বললাম। ভদ্রমহিলার দৃঢ় বিশ্বাস যে তার স্বামী এসে তাকে নিয়ে যাবে বাসায়। সামিনার বাসা ঢাকায়, বড় মেয়েটা এসএসসি পরীক্ষার্থী। কিন্তু নার্সরা বলল অন্য কথা। তার স্বামী লন্ডনে থাকে, ওখানেই আরেকটা বিয়ে করেছে এবং এই কারণেই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তার স্বামী তাকে আর ফিরিয়ে নেবে না বলেই সবার বিশ্বাস। ভদ্রমহিলার জন্য খুব মন খারাপ হয়ে গেল আমাদের। এর পরে আমরা গেলাম আরও একটু বেশি অসুস্থ রোগীদের ওয়ার্ডে। এদেরকে দেখাশোনার জন্য কয়েকজন আয়া আছে। তারাই এদেরকে জামা-কাপড় পরানো, গোসল করানো, খাওয়ানো সবকিছুতেই সাহায্য করে। কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম এদের অবস্থাও খুব একটা ভালো না। এদের বেশিরভাগ রোগীরই বাড়ির লোকেরা আর তাদের খোঁজ নেয় না। প্রথম দিকে একবার দু'বার খবর নিলেও পরে আর তারা তাদের খোঁজ নেয় না। একজন রোগীকে দেখলাম ২৭বছর যাবৎ এই হাসপাতালে আছেন, কিন্তু তার পরিবার আর তাকে নিচ্ছে না। কারণ হিসেবে যা জানলাম তা হচ্ছে পরিবারে একজন মানসিক রোগী আছে জানলে ছেলে-মেয়েদের ভালো বিয়ে দেয়া যাবে না, তাই তাকে আর বাড়িতে ফিরিয়ে নেয়নি তারা। কী রকম বিচার তার সন্তানদের আমি জানি না। যে মা তাদের জন্ম দিয়েছে, বড় করেছে, সেই মাকেই তারা অসুস্থতার জন্য আর ফিরিয়ে নিল না। কী অসুস্থ সমাজেই

যাহোক, এরপরে আমরা গেলাম সবচেয়ে বেশি অসুস্থ রোগীদের ওয়ার্ডে। আসলে আমরা এই ওয়ার্ডে ঢোকার অনুমতি পাইনি আমাদেরই নিরাপত্তার কারণে। এরা সবাই শিকল দিয়ে বাঁধা, গায়ে কাপড় রাখতে চায় না, খাবার খায় না। আসলে তারা স্বাভাবিক কোনো কাজই করতে পারে না। কেউ নিজেই নিজের চুল টেনে ছিঁড়ছে, কেউ অঝোরে কাঁদছে, আবার কেউবা গান গাইছে। গান শুনে আমি সেই রোগীর কাছে গ্রিলের বাইরে এসে দাঁড়ালাম– মেয়েটি রুনা লায়লার বিখ্যাত একটি গান 'শিল্পী আমি শিল্পী' গাইছে। বেশ সুরেই গাইছিল গানটি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো ভালোই গাইলেন রুনা লায়লার গান। মেয়েটি হেসে বলল, আমিই তো রুনা লায়লা। খুবই কম বয়স মেয়েটির, ১৮-২২ বছরের মধ্যে হবে। আমাদের সবারই চোখ ভিজে আসছিল কান্নায়। আরও অনেক কিছুই দেখেছিলাম কিন্তু সেগুলো লেখা সম্ভব না। এতদিন পরে লিখছি তাও মনে হচ্ছে এইতো মাত্র দেখলাম। বুকটা কষ্টে ভারি হয়ে আসে। সেই সাথে আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম এইজন্য যে, তিনি আমাদের সুস্থ রেখেছেন, কর্মক্ষম রেখেছেন, কারণ আল্লাহ চাইলে আমাদেরও ওনাদের মতো অসুস্থ রাখতে পারতেন, বিকলাঙ্গ বানাতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি। তাই আমরা যারা আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছি, কর্মক্ষম আছি, তাদেরও উচিত সাধ্যমতো ঐসব মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

আরশীনগর ঘাট, কাজলার বাঁক, গ্রাম-গুবড়া, জেলা-নড়াইল

আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
প্রাক্তন ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

অংক কষার দিনগুলোতে ছিল দুর্বোধ্য শব্দের জাল।

তোমাকে এখন পর্যন্ত আমার না বলা গল্পের একটাতে আমার মৃত্যু হয়েছিল। সে গল্পে আরো ছিল সময়ের নিদারুণ পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনা। কাজলা নদীর যে বাঁকটা আলতো করে ছুঁয়েছিল হরিচরণ বাজনদারের মাঠ, সেখানেই ছিল আমার স্বরচিত আরশীনগর ঘাট। ছাউনিতোলা নৌকাগুলোর সাথে জোর পাল্লা দিত বিষ্টু গায়েন। লিলুয়া বাতাস খেলে যেত নদীর পানিতে আর তার ছন্দ এসে ধরা দিত বিষ্টু গায়েনের দরাজ গলায়। আমি তাকে শব্দ ধার দিতাম আর নিজের ছায়াগুলোকে মাটি চাপা দিতাম প্রতিনিয়ত। খুব যখন বিকেল, নিজের অস্তিত্ব আর ছায়ারা দীর্ঘ হতে হতে জন্ম দিত সুদীর্ঘ শ্বাসের। সেই সুদীর্ঘ শ্বাসেরা, সেই বিষ্টু গায়েনের সুর মিলিয়ে যেত কাজলার কাদাগোলা জলে।

সেই কাদাগোলা জলেরা জানে আকাশের রঙ কখনো কখনো সিঁদুরে মেশে ভীষণ সন্ধ্যাবেলায়।

গানে বাঁধা পড়ে শব্দরা, তবু তারা সতত স্বাধীন।

আমার আরশীনগর ঘাটে বন্দি সন্ধ্যাগুলোয় লুটিয়ে আছে আমার অতীত। আর বাজনদারের বউয়ের ধূপধুনোয় মিলিয়ে আছে বর্তমান। পাকুড় গাছের পাতায় আমি মুছে এসেছিলাম ভবিষ্যৎ। কানাকুয়ো পাখিটার কথাগুলো বুঝে নেয়ার সময় লিখে ফেলা কবিতাটা তো তোমাকে নিয়েই। আর তা জেনে কানাকুয়োটার কী ভীষণ অভিমান, কী নিদারুণ অভিসম্পাৎ, "ভেসে চলা জলে কোনো গন্ধ ভাসে না, কারো গন্ধ ভাসে না।"

আর এ অভিসম্পাতে তুমি এবার জেনে নাও আমার সমাধিফলক।

কোনো কোনো মানুষ সাঁতার শেখে অকূল জলে যাওয়ার টানে, কূলে ফেরার তার থাকে না কারণ।

তুমি এবার আমার পিছে পিছে হেঁটে আসো। এই দ্যাখো এখন, এখানে কোনো পায়ের ছাপ পড়ে না আর। মাটি এখানে গরমে ধুলো, বর্ষায় কাদা। তবু পায়ের ছাপ নেই। যে ধ্রুপদী প্রেম আমি এঁকেছিলাম অস্তিত্বের প্রগাঢ় মায়ায়; নেই আর। বিষ্টু গায়েনের গানে যে শব্দগুলো বেঁধে দিয়েছিলাম, তারা নেই। হরিচরণ বাজনদারের বউ... তার সিঁদুরের রঙ... সব আগুনে পুড়ে ছাই; নেই... আমার আরশীনগর ঘাট... নেই... ভেসে চলা কাজলার জলে আমার গন্ধ নেই... কোনো গন্ধ নেই...।

অতঃপর অবশিষ্ট থাকে কেবল অধ্যায় গুটিয়ে নেবার গল্প।

ইভটিজিং

লাইছুর রহমান
প্রাক্তন জুনিয়র সুপারভাইজার, সুইং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

লেখাপড়ায় দিচ্ছে ফাঁকি
নকল করে পাশ,
চাকরি করে টিটিসিএম
বেকার বারো মাস।

রাতে করে রাহাজানি
দিনে খেলে তাস,
অন্ধকারে কত লোকের
ঘটায় সর্বনাশ।

এদের ভয়ে যুবতীদের হৃদয় কাঁপে ডরে,
সুযোগ পেলে পথে ঘাটে ওদের পিছু ধরে।
আজেবাজে কথা বলে আরো বাজায় শিস,
ভাবখানা দেখায় যেন বহু দিনের মিশ।

মাঝে মাঝে ভয়ও দেখায় ধরতে চায় কেশ,
বলে, যদি প্রেম না কর করব তোমায় শেষ।
সমাজের এ ত্রাস যারা, বড় লোকের ছেলে,
পুলিশ এদের নাগাল পায় না, যায় না ওরা জেলে।

ধর্ষণ আর অপহরণ এটাই ওদের কাজ,
আঁচল দিয়ে যায় না ঢাকা কলঙ্কেরই লাজ।
দেশবাসী সব জাগো এবার মাকড়শা হটাও,
আইনের হাতে তুলে দিয়ে সমাজকে বাঁচাও।

মুখোশধারী নেতাগণের পোষা কুকুরেরা,
তারাই ওদের বাঁচিয়ে রাখে, যায় না ওদের ধরা।
বিচার হয় না বলে ওদের সাহস বেড়ে যায়,
তাই পথে ঘাটে সুযোগ পেলেই অঘটন ঘটায়।

কল্পনার রাজকন্যা

মোঃ রাকিবুল হাসান মিয়া
সিনিয়র অফিসার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

তুমি মনোহারিণী, তুমি অপরূপা
সুন্দর তোমার মন,
সম্পত্তি ভেবে করব না ছোট
তুমি যে আমার ধন।

নাকে তুমি পরেছ নোলক
হাতে সুন্দর বালা,
রূপবতী তোমায় করেছে আরো
পাথরখচিত মালা।

কোমরে তোমার রয়েছে বিছা
কানে পরেছ দুল,
কী নামে তোমায় ডাকব আমি
ভেবে না পাই কূল।

চোয়াল বেয়ে ঝরছে ঘাম
ভিজেছে তোমার অঙ্গ,
এ কোন নেশায় পাগল হলাম
চাইছি তোমার সঙ্গ।

মানুষ মানুষের জন্য

একেএম গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল
ব্যাবিলন গ্রুপ

লেখালেখিটাকে শখ থেকে এখনো আদতে পরিণত করতে পারিনি। রাতে মাঝে মাঝে দু'কলম লিখতে বসি তবে তা নিতান্তই শখের বসে। ভাবি, কী নিয়ে লেখা যায়। তারপর এলোমেলো চিন্তাগুলো চেপে ধরতে থাকে। আসলে লিখার বিষয়বস্তু নির্ধারণ আমার কাছে বড় কথা না। আমার কেবলই মনে হয়, এই যে লক্ষ মানুষ এ শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের প্রত্যেকের পুরো জীবনটা এক একটা উপন্যাস, আর তাদের জীবনের খণ্ডচিত্রগুলোকে তুলে ধরলে ছোটগল্প লেখা হয়ে যায়। আমার লেখায় কেবলই ইচ্ছে করে ছোট ছোট ঘটনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অসাধারণ দিকগুলোকে আঁকি।

সেদিন হঠাৎ আমার এক বন্ধুর বড় ভাইয়ের সাথে লেখালেখির ব্যাপারে কিছু কথা হলো। আসলে লেখালেখির বিষয়ে যদি কারো সাথে আমার দু'একটা কথা হয় বুঝে নিতে হবে তা আমি শুরু করিনি। কারণ আমার এই শখ নিয়ে আমার লজ্জার অন্ত নাই। শখের বশে একটু আধটু লিখি তা আবার লেখা!

যাহোক, বড় ভাই আমাকে একটা বিষয় নিয়ে লেখার জন্য বললেন, 'মানুষ মানুষের জন্য।' আমি খুব রোমাঞ্চিত বোধ করলাম। কেবলই পাহাড় উল্টানো কোনো ঘটনা খুঁজতে শুরু করলাম এ বিষয় নিয়ে। আইডিয়ার জন্য মানবতাবাদী পণ্ডিতদের জীবনীও পড়লাম ক'দিন। কিন্তু আমি কোনো দিক করতে পারলাম না।

তবে কিছুটা দেরি হলেও হঠাৎ মনে হলো, আমি খুব বেশি ভাবছি। আমার জীবনে কি এমন খুদ্র খণ্ডচিত্র নেই যার সাথে একটু হলেও ঐ বিষয়টি প্রতিবিম্বিত হয়– 'মানুষ মানুষের জন্য' কথাটি। আমার ডায়েরি খুঁজতে গিয়ে অনেক আগের একটা ঘটনা পেয়েও গেলাম। সেই ঘটনাটিই একটু স্থান-কাল ভেদে আধুনিকীকরণ করে একটা গল্প দাঁড় করালাম। যা লিখলাম তা হুবহু তুলে দিলাম। কেমন হলো সে প্রশ্ন করা থেকে আমি দূরে থাকি। পাঠকরা না হয় মনে মনেই মন্তব্য করবেন।

মাসুদ ভাইকে বরাবরই আমরা বন্ধুরা একটু পাগল হিসেবেই চিনতাম। তার মাঝে নিজেকে সাধু ভাবার একটা হাস্যকর প্রবণতা দেখেছি। যখন থেকে এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, আমরা আস্তে আস্তে তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করলাম। এর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছিল তার কিছু 'গায়ে মানে না আপনি সাধু' টাইপ আচরণ। আমরা দু'একজন বন্ধু যারা একসাথে চলতাম তাদের সবার সাথে তার এমন দু'একটা আচরণ আছে। সবারটা লেখার অবকাশ নেই, তবে লেখার খাতিরে আমার সাথে যা করেছিলেন তা একটু সংক্ষেপে লিখছি।

একবার আমরা পাড়ার চা দোকানে বসে চা খাচ্ছি। হঠাৎ সেখানে মাসুদ ভাইয়ের আগমন। আমাকে বললেন, মহি ৫০টা টাকা দে তো। আমি বিব্রতকর সিচুয়েশনে পড়ে গেলাম। আমরা সব বন্ধুরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বিশেষ করে আমার পরিবারের অবস্থা অন্যদের চেয়ে আরো খারাপ। বাবা-মায়ের কাছে হাত খরচের টাকা না চেয়ে নিজেই দু'একটা টিউশনি শুরু করেছি কিন্তু পারিশ্রমিক হিসাবে যা পেতাম তা খুবই নগণ্য।

মাসুদ ভাইয়ের সৌভাগ্যবশত এবং আমার দুর্ভাগ্যবশত সেদিনই একটা টিউশনির মাইনে পেয়েছিলাম। পকেটে টাকা রেখে তাই মিথ্যে বলতে পারলাম না যে টাকা নেই। পঞ্চাশ টাকা বের করে দিলাম। তার সাথে একজন যুবক ছিল যাকে প্রথমে আমরা লক্ষ্য করিনি। মাসুদ ভাই টাকাটা ওই যুবককে দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর আমাদের বললেন যে, ওই যুবক এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ওরা খুব সমস্যায় আছে। ওরা দু'জন দু'জনকে ভীষণ ভালোবাসে এবং বিয়ে করবে। এই টাকা দিয়ে তিনি তার আংশিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আর ঐ ছেলেকে কিছু টাকা দিয়ে একটা ব্যবসা ধরিয়ে দিলে নাকি পুরো দায়িত্ব পালন হবে।

ব্যাপার শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। পরের ধনে পোদ্দারি শুনেছি কিন্তু পরের ধনে সাধুগিরি এমনটা শুনিনি। যাইহোক, এই মাসুদ ভাই-ই আমাদের একবার জড়ো করলেন কাঠপট্টির মাঠে। যখন আমরা সবাই এসে হাজির হলাম মাসুদ ভাই সবাইকে বললেন- একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডে ভয়ানক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। একটা টেম্পোর সাথে মালবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আরো কয়েকজনের অবস্থা আশংকাজনক। নিকটস্থ ক্লিনিকে তাদের ভর্তি করা হয়েছে। মাসুদ ভাই সেখানে গিয়েছিলেন। আহতদের অবস্থা দেখে তিনি শিউরে উঠেছেন। আহতদের মধ্যে একজন মাঝবয়সি মহিলা আছে। সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। তার বাচ্চা শিশুটাকে মহিলা এমনভাবে বুকে আকড়ে ধরেছিল যে শিশুটা অক্ষত আছে কিন্তু মহিলার অবস্থা আশংকাজনক। তার অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছে। ছোট হাসপাতাল বলে রক্ত মজুদ নাই। তিনি চান আমাদের মাঝে যার রক্তের গ্রুপ 'এবি পজেটিভ' সে যেন রক্ত দিয়ে মহিলার জীবন বাঁচায়। এমন আহ্বানে না করা কঠিন।

আমরা পাঁচজন রওনা হলাম সেই ছোট্ট হাসপাতালে। পাঁচজন রওনা হওয়ার কারণ আমরা কেউ কারো রক্তের গ্রুপ জানি না। যার রক্তের গ্রুপ মহিলার সাথে মিলবে সে রক্ত দেবে। হাসপাতাল আমাদের এলাকা থেকে বাসে সাত মিনিটের পথ। যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাস্থল অতিক্রম করতে হলো। যা দেখলাম শিউরে উঠার মতো। পিচঢালা রাস্তায় চাপ চাপ কালো রক্ত পড়ে আছে। রাস্তার পাশে লোহার দুমড়ানো একটা স্তুপ পড়ে আছে। ভালোভাবে তাকিয়ে বুঝলাম এই সেই টেম্পু যা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। সবাই যার যার মতো কথা বলে যাচ্ছিল। শাহেদ বলল, এই রাস্তাকে আমেরিকার 'ট্রিপল সিক্স' রোডের সাথে তুলনা করলে ভুল করা হবে না। প্রতিদিন একটা না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছেই। অন্যরা তাতে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। মাসুদ ভাইকে দেখলাম কেমন যেন অন্যমনস্ক।

কিন্তু আমার ভেতরে কী হচ্ছিল তা কেউ জানল না। আসলে নিতান্তই এড়াতে পারিনি বলেই হাসপাতালে যাচ্ছি। কিন্তু যতবার রক্ত দেবার কথা ভাবছি আমি শিউরে উঠছি। শৈশব থেকেই রক্ত, সুঁচ, সিরিঞ্জ, ইনজেকশন এসব ব্যাপারের প্রতি আমার অবর্ণনীয় একটা ভীতি রয়েছে। এটা ওরা কেউ জানে না। আমার বয়স যখন ছয় আমাকে টিটেনাস এর টিকা দেয়ার জন্য ক্লিনিকে নেয়া হয়েছিল। সে টিকা দেয়ার সময় ডাক্তার এবং আমার মধ্যে এমন ধস্তাধস্তি হয়েছিল যে ডাক্তার বেচারা শেষ পর্যন্ত পড়েই গিয়েছিলেন। আমিও চিৎকার চেঁচামেচি করে ডাক্তারখানা মাথায় তুলেছিলাম। এরপর আমার জীবনে যেখানেই প্রতিকূলতা দেখেছি সরে থেকেছি, কিন্তু আজ যদি রক্ত আমাকেই দিতে হয়! টেনশনে পেটে মোচড় দিতে থাকল। আমার আবার IBS (Irritable bowel syndrome) আছে। এটা যাদের থাকে টেনশন হলেই তাদের টয়লেটের বেগ পায়।

যাহোক, হাসপাতালে যখন পৌঁছলাম মনে হলো কেমন ভীতিকর একটা পরিবেশ। কান্না আহাজারিতে হাসপাতালের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। শুনলাম যারা আহত হয়েছে তাদের মধ্যে আরো দু'জন মারা গেছে। তাদের লাশ দেখলাম হাসপাতালের ফ্লোরে চিত হয়ে পড়ে আছে।

আমি ভেতরে ভেতরে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে থাকলাম যে এত মোটাতাজা বন্ধুদের টপকে রক্তের গ্রুপ নিশ্চয়ই আমার মতো কঙ্কালসার মানুষটার সাথে মিলবে না। ইংরেজিতে একটা ইডিওম আছে 'Irony of fate' যার বাংলা অর্থ 'অদৃষ্টের পরিহাস।' আমার ক্ষেত্রে সেই অদৃষ্টই পরিহাস করল। সেই আহত মহিলার রক্তের গ্রুপ আমার সাথেই মিলল।

আমি মাসুদ ভাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, আমার পক্ষে রক্ত দেয়া সম্ভব না। মাসুদ ভাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন, মহি সেই গানটি শুনিসনি? মানুষ মানুষের জন্য–জীবন জীবনের জন্য।

আমি বললাম, শুনেছি।

মাসুদ ভাই বললেন, আজ তোর জন্য তা প্রমাণের সুযোগ এসেছে, সুযোগ এসেছে একটা ছোট্ট শিশুর কাছে তার মা'কে ফিরিয়ে দেয়ার।

আমি মাসুদ ভাইয়ের কথায় একটু বিব্রত বোধ করলাম। তিনি সবার মাঝখান দিয়ে আমাকে বহির্বিভাগের একটা বেডে নিয়ে গেলেন। সেই বেডে এক মৃতপ্রায় নারী অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তার পেটের ডানপাশ দিয়ে একটা গর্তের মতো হয়ে সেখান দিয়ে চুইয়ে তখনো রক্ত ঝরছে। তুলা ও কটন প্যাড দিয়ে রক্ত বন্ধের চেষ্টা করা সত্ত্বেও রক্তক্ষরণ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। সব আহত রোগীর পাশে তাদের আত্মীয়-স্বজন ভিড় করেছে। শুধু তার অচেতন দেহটার অপর পাশে ফুটফুটে এক শিশু। সে তখনও ভালো করে দাঁড়াতে পারে না। শিশুটি কচি কান্না দিয়ে তার মাকে জাগানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। অবুঝ শিশুটি বুঝতে পারছে না তার মা মৃত্যুর সাথে লড়ছে।

মাসুদ ভাই শিশুটাকে কোলে নিলেন। শিশুর কান্না একটু স্তিমিত হলো, কিন্তু সে তার মায়ের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই রইল। আমার দিকে শিশুটাকে এগিয়ে দিয়ে মাসুদ ভাই বললেন, মহি সৃষ্টিকর্তা তোকে মানুষ করেছে, দিয়েছে বিবেক আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। সেই অফুরন্ত প্রাণশক্তির কিছুটা খরচ করে তুই কি এ শিশুর কান্না থামাবি না?

আমার ভেতরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল, কে জানে সম্মোহিত (Hypnotized) হয়ে গেলাম কিনা। আমি এক মুহূর্ত দেরি না করে বললাম, অবশ্যই ভাই। আমি মানুষ, এই মাটির মানুষ। মানুষ তো মানুষেরই জন্য।

সপ্তাহখানেক পর ঐ শিশু এবং শিশুর মা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। মহিলার স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি বার বার আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তবে কৃতজ্ঞতাটা আমার কাছে অত্যুক্তি মনে হলো। মানুষ মানুষের বিপদে এগিয়ে আসবে এটাই রীতি, তাই নয় কি?

পঞ্চপাণ্ডব

কাজী এ এম তুষার আলম
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

হেমন্তে কোনো বসন্তেরই বাণী, পূর্ণশশী ঐ যে দিলো আনি।
বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপ্ন জাগায়
কোনো গোপন কানাকানি পূর্ণশশী ঐ যে দিলো আনি।

– রবিঠাকুর

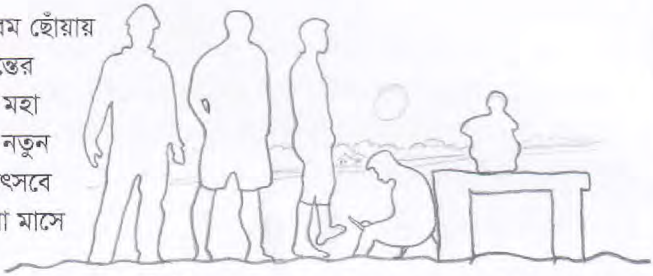

শরতের কাশফুলের নরম ছোঁয়ায় শারদীয় বিয়োগে হেমন্তের যোগ। বাঙালি জাতির মহা উৎসব এই হেমন্তেই। নতুন ধানের ভাত ও পিঠা উৎসবে ব্যস্ত থাকে দেশ। বারো মাসে ষোল পার্বণের অনেক উৎসবই চলে এই হেমন্তজুড়ে। পূর্ণশশীর সূত্র ধরে চলে রাসমেলার দারুণ উৎসব। জগদ্ধাত্রী পূজা, অকালবোধন (কাত্যায়নি পূজা), কালী পূজা, ভাই ফোঁটা যুগ যুগ ধরে লালন করে আসছে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণ। কোনো কোনো উৎসব শুধু একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ডাল-পালা মেলে সমগ্র বাঙালি জাতির উৎসবে পরিণত হয়েছে অতীত থেকে বর্তমান এবং যার বিস্তৃতি থাকবে সুদূর ভবিষ্যত পর্যন্ত, যতদিন না এই জাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আয়নার মতো জলের স্থিরতা ও জলে ফোটা পদ্ম, শাপলা এই ঋতুর এক অনাবিল সৌন্দর্য। দু'চোখ জুড়িয়ে যায় হেমন্তের বৈচিত্রে। জল নেমে যাওয়ার পরে শৈবালের ডুবে থাকা নিথর দেহখানি ঠিক যেন পটে আঁকা মায়ের রঙিন আঁচলের মতোই মনে হয়। নবান্নের পরে যখন ধানের নাড়াগুলো স্তুপ করে রাখা হয় মাঠে মাঠে তার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হেমন্তের মাটির সোঁদা গন্ধ মনে করিয়ে দেয় আমি বাঙালি।

এমনভাবেই হেমন্তের দিনগুলির বিবরণ দিচ্ছিলেন মাহমুদ ভাই। তার বিবরণীতে আমি কোথায় যেন হারিয়ে যেতে থাকলাম। শৈশবের সেই হেমন্তের দিনগুলি চোখের সামনে আয়নার মতো ভেসে উঠতে থাকল। উত্তর জনপদে হেমন্তকাল থেকেই হালকা শীতের আগমন ঘটে। শীতকে কোনঠাসা করতে সামান্য উষ্ণতার জন্য হেমন্তের ধানের নাড়া বেশ সহযোগিতা করে। নাড়ার আগুনে শরীর উষ্ণ করার পাশাপাশি চলতে থাকে নাড়ু, মুড়ি ও ভাঁপাপিঠা উৎসব। বয়োজ্যেষ্ঠরা নাড়ার আগুনে আঙ্গুলের বিলি কাটতে কাটতেই করতে থাকে খোশগল্প ও পুরোনো দিনের কথা। আমরা শিশুরা ছিলাম সরব শ্রোতা ও প্রশ্নকর্তা।

আমি ভাবতে ভাবতেই কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম। অফিসের মধ্যে চোখ যতদূরে যায় প্রসারিত করে স্মৃতিরোমন্থন করছিলাম। এমন সময় সাজ্জাদ ভাই এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মলিন নয়নে তাকিয়ে বলল, 'আর ভালো লাগে না।' সব স্মৃতি যেন সিডরের গতিবেগে আবার ফিরে যেতে লাগল। ঘোর কাটলে আমি হতাশ দৃষ্টিতে অনেকটা দাঁত কামড়ে জিজ্ঞেস করলাম– কী হইছে?

দিনটি ছিল ১৪ই অক্টোবর ২০১৭। সাজ্জাদ ভাইয়ের মলিনতা কাটাতে মাহমুদ ভাই প্রস্তাবনা দিলো তার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর ভ্রমণ ও হেমন্ত দর্শনের। অনেকবারই আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম অঞ্চলটি ঘুরে আসার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মাহমুদ ভাইও খুব একটা হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। আমি ও সাজ্জাদ মাথা নোয়াতেই শুরু হলো ভ্রমণ পরিকল্পনা, সাথে যোগ দিলেন অবধায়ন শাখার সবুজ ভাই। বেশ ঘটা করেই পরিকল্পনা করা হলো। সাজ্জাদের মুখে যেন হাসি ফুটল। অবশেষে কোথাও যাওয়া হচ্ছে। চারজনই একটা অদ্ভুত আনন্দে ভ্রমণের পরিকল্পনা সম্পন্ন করলাম। ভ্রমণের তারিখ নির্ধারণ করা হলো ১৯শে অক্টোবর ২০১৭। সাজ্জাদের চোখ দু'টো চিক চিক করে উঠল পরম আনন্দে।

বেশ মহাসমারোহেই ভ্রমণের পট আঁকতে থাকলেন মাহমুদ ভাই। কী খাব, কোথায় যাব, কী দেখব সবকিছু মিলেই এক অনন্য আয়োজন করতে থাকলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই আমরা চারজন মিলে অথবা দু'জন মিলে এ নিয়ে আলোচনা করতে থাকি। মাহমুদ ভাই ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য। মুকসুদপুর আমাদের যেন খুব চেনা, একমাত্র কারণ তার বর্ণনা ও ছবির কল্যাণে। কোথায় তিল, কোথায় তাল সবই তার ছবিতে দেখতে দেখতেই তার এলাকা নিয়ে আমাদের একটা সম্যক ধারণা হয়ে গিয়েছিল। ভ্রমণের শেষ প্রস্তুতি হিসেবে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাচ্ছিলেন কোন মাছ খাব, কোথায় চা খাব, কোথায় মিষ্টি খাব ইত্যাদি এবং তার সাথে শেষে একটা বাক্য থাকত– 'ঐটা অসাধারণ।' আমরা মোটামুটি একটি চিত্র পেয়ে গেছি মুকসুদপুরের রামকৃষ্ণপুর নামক গ্রামটির। কাজের ফাঁকে অবসর সময়টা বের করা বড়ই মুশকিল, কিন্তু তারপরেও আমরা দু'চার মিনিট সময় পেলেই প্রস্তুতির শেষ অবস্থাটা ঝালিয়ে নিতাম। শেষ দিনের প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ জাহাঙ্গীর ভাই যোগ দিলেন আমাদের ভ্রমণের বয়োকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে। অনেকটা আচমকাই তার সংযোজন হলো পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চম সদস্য হিসেবে। মহাভারতের পঞ্চরত্নের তালিকা পূর্ণ করলেন তিনি। পঞ্চপাণ্ডবের সাথে আমাদের পার্থক্য এতটুকুই আমরা কোনো বনবাসের উদ্দেশ্যে নয় বরং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। আর দ্রৌপদীর আগমনের তো এখানে কোনো প্রশ্নই নেই।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা প্রস্তুত কিন্তু বাধ সাধল নীল আকাশে কালো মেঘের ডামাডোল। ভ্রমণের আগের রাত থেকেই টানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে যেটা থামার কোনো লক্ষণ নেই। সাজ্জাদ ভাই বলেই ফেলল– এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যাব না। আমরা আবারও হতাশ

হলাম পরিকল্পনা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে। বৃষ্টি থেমে গেলে আবারও আমরা ঐক্যবদ্ধ হলাম রওনা দেয়ার জন্য। পঞ্চপাণ্ডবের দুই সদস্য মাহমুদ ভাই ও জাহাঙ্গীর ভাই তখনও এসে পৌঁছায়নি। যাত্রায় আবারও অমানিশার ঘোর অন্ধকার দেখা দিলো মাহমুদ ভাইয়ের H&M এ জরুরি মিটিং থাকার কারণে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম কখন মাহমুদ ভাই পৌঁছাবে। অবশেষে মেঘের পরে রোদ উঠার সম্ভাবনা দেখা দিলো। মাহমুদ ভাই H&M থেকে মিটিং শেষ করেই একটা ফোন দিলো, 'আমি আসছি।' আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করেই আমরা যাত্রার প্রস্তুতি নিলাম।

'অবশেষে যাওয়া হচ্ছে'– সবুজ ভাইয়ের মুখ থেকে অনাদরে রাখা বাক্যটা বেশ আদরেই বেরিয়ে আসলো। মেঘের কালি এখন কেটে গেছে, খুব রৌদ্রজ্জ্বল দিন না হলেও আকাশটা আর মনমরা হয়ে নেই। পঞ্চপাণ্ডবের রথ ছুটছে অবিরাম গতিতে। আমাদের প্রিয় সারথী রফিকের হাতে রথের চাবুক। পথিমধ্যে হালকা গান, খুনসুটি করতে করতেই আমাদের রথ দু'পাশের হেমন্ত ছাপিয়ে পৌঁছে গেল মাওয়া ঘাটে।

"বাইরে বেরোলেই এত ক্ষুধা লাগেরে তুষার, দাঁড়া ফেরিতে ওঠার আগে কিছু খেয়ে নেই।" সাজ্জাদের সাথে বেশ কয়েকটি ভ্রমণ আমি করেছি এবং তার এই বাক্যটি খুবই পরিচিত। পঞ্চপাণ্ডব একটি হোটেলে ঢুকে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। মাওয়া ঘাটে রাণীগঞ্জ ফেরিটা যেন কালের স্বাক্ষী। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৯৫ সালে এই ফেরিটা রূপ-সৌন্দর্যে অসম্ভব সুন্দর ছিল এবং এই ফেরিতেই আমি প্রথম নগরবাড়ি ঘাটে আরোহন করি। আবারও সেই ফেরির দেখা মিলল তাই কতক্ষণ তার উপর মোবাইল ফটোগ্রাফি করলাম। বয়সের ভারে ফেরিটা এখন সে রকম যুবতী আর নাই, আজ সে বৃদ্ধা।

বাংলাদেশে প্রায় ৭০০ নদী আছে। তারই মধ্যে ২য় বৃহত্তম দীর্ঘ নদী যেটা ভারতে গঙ্গা, ভগিরথি নাম ধরে বাংলাদেশে পদ্মা নামে প্রবেশ করে। পদ্মা বহুমুখী সেতু লৌহজং মুন্সিগঞ্জ থেকে শরিয়তপুর ও মাদারীপুরকে সংযোগ করবে। ৬.১৫ কিমি সেতুটি নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করে যাচ্ছে ২৪শে এপ্রিল ২০১৪ সাল থেকে। পদ্মা সেতুটির কাজ সম্পন্ন হলে এটি হবে বাংলাদেশের বৃহত্তম সেতু যেটা যমুনা সেতুর চেয়েও বড়। সেতুটির নির্মাণশৈলী দেখার আমার অনেক ইচ্ছা ছিল যেটা বাস্তবে রূপান্তরিত হলো। সেতুটি ঘিরে সব শ্রমিক রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন রাণীগঞ্জ ফেরি করে সেতুর স্থাপনার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার মনে হলো মানিক বন্দোপাধ্যায় এই সময়ে পদ্মা নদীর মাঝি লিখতে গেলে 'কুবের মাঝি' চরিত্রটির রূপায়নটা একটু অন্যরকম হতো।

মুকসুদপুর মোড়ে নেমে এককাপ চা না খেলেই নয়। এর আগেও আমি এই মোড়ে চা খেয়েছি যখন আমরা ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্যগণ সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিলাম।

এই মোড়ের চায়ের আসলেই কোনো তুলনা হয় না। মোড় থেকেই সোজা সাপের মতো সড়কটি চলে গেল খুলনার দিকে এবং বামে চলে গেল বনগ্রাম বাজারের দিকে। চা পান করার এক পর্যায়ে সবুজ ভাইয়ের অন্ধকারে উড়ে যাওয়ার বিষয়টা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল। আনন্দের মিছিলে বাঁধন দেওয়াটা খুবই দুরূহ ব্যাপার। সবুজ ভাই অতিদ্রুত গতিতে আমার দিকে আসতে থাকল, হঠাৎ দেখি উনি উড়ে যাচ্ছেন। কিছু বোঝার আগেই ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। দেখা গেল উনি যে রাস্তাটা দিয়ে আসছিলেন সেটা সমতল নয়, মাঝখানে একটা বাঁধা ছিল। সবাই হেসে উঠলেও পরম মমতায় তার সেবা করতে দলের কেউই কার্পণ্য করেননি। সবুজ ভাই যে ব্যথা পেয়েছেন সেটা কাউকে বুঝতে দিতে চাননি। কোনো ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ভ্রমণ হলেও ভ্রমণকালীন আপদ-বিপদে সহযোগিতাটাও বাঞ্ছনীয়। মুকসুদপুর মোড় থেকে বনগ্রাম যাওয়ার রাস্তাটা অসাধারণ। মনে হলো গ্রাম্য একজন কিশোরী হেলেদুলে যেদিক দিয়ে চলে গেছে সেই দিকে এই রাস্তাটিও চলে গেছে। দুই পাশে সারি সারি গাছের গায়ে বয়সের ছাপ থেকে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে রাস্তাটি দীর্ঘদিনের স্থাপনার একটি সাক্ষী। এই রাস্তার সাথে মিশে আছে বনগ্রামগামী সকল মানুষের ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। দু'পাশে হেমন্তের গন্ধ আমাদের গ্রামবাংলার চিরচেনা একটা ঐতিহ্য। বাংলাদেশের ষড়ঋতুর দেশ বলেই এই বৈচিত্রটা আমরা সহজেই অবলোকন করতে পারি।

আমি, সাজ্জাদ, জাহাঙ্গীর আর সবুজ ভাই বাজারটা ঘুরে দেখছিলাম। ছোট্ট একটা বাজার আয়তাকৃতি আলুথালুভাবে এদিক-ওদিক দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। বনগ্রাম বাজারের মাঝ দিয়ে সোজা হেঁটে আমরা একটি রাস্তায় উঠলাম। যেহেতু বনগ্রাম বাজারে আমরা সবাই নবীন, সেহেতু আমরা সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। পথিমধ্যে জাহাঙ্গীর ভাই ও সবুজ ভাইয়ের ছেদ ঘটলে আমি ও সাজ্জাদ পা বাড়ালাম এক অন্ধকার সড়কে।

– ভাই যাবেন?
– যাব, কোথায় যাবেন?
– আমরা নতুন চিনি না, আপনি যেদিকে খুশি নিয়ে যান।

ভ্যানচালক হেলাল ভাইয়ের দুই সন্তান। তিনি আগে গার্মেন্টসে কাজ করতেন। ছেলেমেয়ের পড়াশুনার জন্য তিনি গ্রামে চলে এসেছেন এবং স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যে কয় টাকা পায় তাই দিয়ে উনি অত্যন্ত খুশিভাবে জীবন যাপন করছেন। অতিরিক্ত চাহিদা খুব খারাপরে ভাই, হেলাল ভাই বললেন। হেলাল ভাইয়ের ভ্যানে উঠে বেশ ভালোই লাগছে। সরু একটা রাস্তা দু'পাশে সারি সারি গাছ নিয়ে অনেকদূর চলে গেছে বোঝা যাচ্ছে। ভ্যানের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে আসছিল না। সন্ধ্যা ৮টা বাজে অথচ এখানে মনে হলো নিঝুম রাত। মিশকালো অন্ধকারে বুকটা একটু দুরু দুরু করে কাঁপছিল। হেলাল ভাই মাথা দোলাতে দোলাতে ভ্যান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নিরবতা ভেঙে সাজ্জাদ জিজ্ঞেসা করল–

– এই গ্রামের নাম কী?
– আইকদিয়া
– এর পরে কোন গ্রাম?
– পাইকদিয়া
– এর পরে!
– বাঘাদিয়া।
আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম।

চৌরাস্তায় একটা সেতুতে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ভ্যানচালককে জিজ্ঞাসা করতে সে জানাল বামে মিলিকশ্রীরামপুর, ডানে রামকৃষ্ণপুর। আমরা আমাদের গন্তব্যের অতি সন্নিকটেই আছি। আমরা আইকদিয়া পার হয়ে পাইকদিয়ায় যখন পৌঁছালাম তখনও অন্ধকার কাটেনি। অগত্যা ফিরে এসে আবারও চৌরাস্তার সেই সেতুতেই নামলাম। আমি ও সাজ্জাদ হাঁটছি কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পারছিলাম না। জোনাকি পোকা থেকে যতটুকু আলো আসছিল সেটাই আমাদের পথ চলার জন্য যথেষ্ট। কিছু ঝিঁঝি পোকার ডাক মাঝে মাঝেই নিঃশব্দের নিরবতা ভেঙে দিচ্ছিল। আমরা ফিরে এসেই মাহমুদ ভাইয়ের বন্ধু মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম। বনগ্রাম বাজারটা ছোট হলেও প্রচুর লোকের আনাগোনা বাজারটিতে। সব সময় চঞ্চল পরিবেশ। আমরা ৫০নং বনগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে চা খেয়ে রওনা দিলাম মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের বাসার দিকে। জানতে পারলাম এই স্কুলটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই স্কুলেই মাহমুদ ভাই পড়াশুনা করেছেন।

ভাতে-মাছে বাঙালি এই জিনিসটা আরও একবার খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন মোহাম্মদ আলী ভাই ও তাঁর স্ত্রী। অনেক রকম মাছ-মাছালির আয়োজন ও মমতাভরা রান্না আমাদের শুধু ক্ষুধা নয় মনের তৃপ্তি মিটিয়ে দিলো। সরু পথ দিয়ে ফিরে আসার সময় কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকালাম যদি আবার কখনও ফিরে আসি তবে আরেকবার আতিথেয়তা গ্রহণ করব।
– এখানে নামতে হবে।
– কেন!
– এরপরে আর গাড়ি যাবে না।
– কেন?
– এরপরে মাটির রাস্তা।
– কেন?
সবুজ ভাইয়ের এতগুলো প্রশ্নের জবাব মাহমুদ ভাই এক কথায় দিলেন।
– রাস্তার মাঝে খাম্বা আছে।
ওহ কী অবস্থা!

ছোট্ট একটি মাটির সরু রাস্তা মাঝে মাঝে উপুর করে ইট বিছানো। দুই পাশে হেমন্তের বৈচিত্র নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাই। রাস্তা পিচ্ছিল কারণ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রথমে আমরা মনে করলাম শীতের আগমনী বৃষ্টি কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ভুল ভাঙল। সমুদ্রের নিম্নচাপের কারণে অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছে এবং ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত এরকমই থাকবে। আমরা হতাশ হয়ে গেলাম। হেমন্ত দেখতে এসে বৃষ্টি যেন সব কিছুকেই ওলটপালট করে দিলো। যেহেতু আমরা এসেই পড়েছি সেহেতু হতাশ না হয়ে পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা পিপীলিকার মতো সারি বেঁধে হাঁটতে লাগলাম। ডান প্রান্তে একটি বিশাল খাল দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেছে। বামদিকে নিচু জমি। বৃষ্টির পানি নেমে যাওয়ার পর শৈবালগুলি মাথা নিচু করে নির্বাক তাকিয়ে আছে। খালের উপরে শাপলা ফুলের মেলা চলছে। হিজল গাছগুলি মাথা নুয়ে আমাদের স্বাগতম জানাল রামকৃষ্ণপুর নামক গ্রামটিতে। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর রাত এগারোটায় আমরা সোজা উঠে গেলাম মাহমুদ ভাইয়ের নবনির্মিত বাংলো বাড়িতে।

রাতভর বৃষ্টির ছন্দে একটা গভীর ঘুম হলো। সকালে উঠেও বৃষ্টি।
– হাঁটতে যাবি সাজ্জাদ?
– বিরক্ত করিস নাতো তুষার (ভোরবেলার ঘুম অনেক দামি বুঝা গেল)।
টানা বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে যাওয়ার বিষয়টাও খুব একটা সুবিধার না। টিনের চালে বৃষ্টির নূপুর-নৃত্য বেশ ছন্দে ছন্দে তাল বাজিয়ে যাচ্ছে। রোদ থাকতে পারে বলে আমরা মাহমুদ ভাইয়ের বিশালাকৃতির একটি ছাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। সাজ্জাদ সঙ্গী না হলেও ছাতার ভিতর আরেকজন সঙ্গী পেলাম সবুজ ভাইকে। পিচ্ছিল রাস্তায় মাটি কামড়ে আমরা হাঁটতে বেরোলাম। হেমন্ত-বর্ষা মিলে আমরাও একটি মিশ্র অনুভূতি অনুভব করছিলাম। ভালো লাগছে বৃষ্টির রিনিঝিনি শব্দ।

"কেমন বৃষ্টি ঝরে–মধুর বৃষ্টি ঝরে–ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে–রোদে যে বৃষ্টি ঝরে আজ–কেমন সবুজ পাতা–জমির সবুজ আরও–ঘাস যে হাসির মতো"

জীবনানন্দ দাস তার লেখায় গ্রাম বাংলার অনেক রূপই বর্ণনা করেছেন নিজের ভাষায়। বাস্তব উপলব্ধিটাও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়। বৃষ্টিকে আমরা বিদায় দিয়ে দিলাম শরতের আগেই। কিন্তু আবারও এই বৃষ্টির আগমন যেন আমাদের মাঝে অনন্ত প্রেমেরই অবদান।

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন সলিলে মিলন মধুর লাজে–

ছোট্ট একটি মাটির সরু রাস্তা মাঝে মাঝে উপুর করে ইট বিছানো। দুই পাশে হেমন্তের বৈচিত্র নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাই। রাস্তা পিচ্ছিল কারণ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রথমে আমরা মনে করলাম শীতের আগমনী বৃষ্টি কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ভুল ভাঙল। সমুদ্রের নিম্নচাপের কারণে অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছে এবং ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত এরকমই থাকবে। আমরা হতাশ হয়ে গেলাম। হেমন্ত দেখতে এসে বৃষ্টি যেন সব কিছুকেই ওলটপালট করে দিলো। যেহেতু আমরা এসেই পড়েছি সেহেতু হতাশ না হয়ে পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা পিপীলিকার মতো সারি বেঁধে হাঁটতে লাগলাম। ডান প্রান্তে একটি বিশাল খাল দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেছে। বামদিকে নিচু জমি। বৃষ্টির পানি নেমে যাওয়ার পর শৈবালগুলি মাথা নিচু করে নির্বাক তাকিয়ে আছে। খালের উপরে শাপলা ফুলের মেলা চলছে। হিজল গাছগুলি মাথা নুয়ে আমাদের স্বাগতম জানাল রামকৃষ্ণপুর নামক গ্রামটিতে। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর রাত এগারোটায় আমরা সোজা উঠে গেলাম মাহমুদ ভাইয়ের নবনির্মিত বাংলো বাড়িতে।

রাতভর বৃষ্টির ছন্দে একটা গভীর ঘুম হলো। সকালে উঠেও বৃষ্টি।
– হাঁটতে যাবি সাজ্জাদ?
– বিরক্ত করিস নাতো তুষার (ভোরবেলার ঘুম অনেক দামি বুঝা গেল)।
টানা বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে যাওয়ার বিষয়টাও খুব একটা সুবিধার না। টিনের চালে বৃষ্টির নূপুর-নৃত্য বেশ ছন্দে ছন্দে তাল বাজিয়ে যাচ্ছে। রোদ থাকতে পারে বলে আমরা মাহমুদ ভাইয়ের বিশালাকৃতির একটি ছাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। সাজ্জাদ সঙ্গী না হলেও ছাতার ভিতর আরেকজন সঙ্গী পেলাম সবুজ ভাইকে। পিচ্ছিল রাস্তায় মাটি কামড়ে আমরা হাঁটতে বেরোলাম। হেমন্ত-বর্ষা মিলে আমরাও একটি মিশ্র অনুভূতি অনুভব করছিলাম। ভালো লাগছে বৃষ্টির রিনিঝিনি শব্দ।

"কেমন বৃষ্টি ঝরে–মধুর বৃষ্টি ঝরে–ঘাসে যে বৃষ্টি ঝরে–রোদে যে বৃষ্টি ঝরে আজ–কেমন সবুজ পাতা–জমির সবুজ আরও–ঘাস যে হাসির মতো"

জীবনানন্দ দাস তার লেখায় গ্রাম বাংলার অনেক রূপই বর্ণনা করেছেন নিজের ভাষায়। বাস্তব উপলব্ধিটাও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়। বৃষ্টিকে আমরা বিদায় দিয়ে দিলাম শরতের আগেই। কিন্তু আবারও এই বৃষ্টির আগমন যেন আমাদের মাঝে অনন্ত প্রেমেরই অবদান।

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন সলিলে মিলন মধুর লাজে–

পুরাতন প্রেম নিত্য নতুন সাজে।"

প্রকৃতির আবারও নবরূপে বৃষ্টির সাথে মিশে যাওয়াটাও নতুন কিছু নয়। আমরা যতই এগোচ্ছিলাম ততই অবাক হচ্ছিলাম। আমরা ফিরে এলাম পুরো পঞ্চপাণ্ডব মিলেই এই অপরূপ সৌন্দর্য ভাগাভাগি করার জন্য।

বৃষ্টির সময় রাস্তার পাশে ছোট্ট দোকানে জবুথবু হয়ে এককাপ চা খাওয়ার মজাটাই আলাদা। পাঁচজন মানুষ একটি ছাতার ভেতরে পৃথিবীর সবচেয়ে কম জায়গা দখল করে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই রাস্তার পাশে সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। বৃষ্টি হচ্ছিল যদিও কিন্তু হেমন্তের প্রভাব যায়নি। ছোট ছোট ফার্ন, গুল্ম তার সৌন্দর্য বিলিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতির মাঝে। তালগাছগুলি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আগমনী শীতে রস প্রসব করার জন্য। হ্যাঁ, বৃষ্টির মাঝেই আমরা পরিপূর্ণ হেমন্তকে খুঁজে পেলাম। আমাদের ভ্রমণ একেবারেই অপূর্ণ থাকেনি। হেমন্তেও বর্ষার মিশ্রণ থাকায় হেমন্তকে আরও অসম্ভব সুন্দর লাগছিল। মনে পড়ে গেল বাংলার কিংবদন্তী সুফিয়া কামালের কবিতা–

"সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লিখে
কোন পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে?"

সবকিছু যেন আমাদের পরিচিত। মনে হয় কতদিনের চেনা! আমরা যে অঞ্চল থেকেই আসি না কেন অঞ্চলভেদে ঋতুর বিষয়টা ভিন্নমাত্রার হলেও ঋতুর মৌলিকতা ভিন্ন কিছু নয়। জাহাঙ্গীর ভাই মাঝে মাঝেই গুনগুন করে গান গেয়ে উঠছিলেন প্রকৃতিকে নিয়ে। দু'একটা কোরাসও হলো। মাথার উপর ছাতা, তার উপর বৃষ্টি, তার উপরে আকাশের কান্না। আমরা খালি পায়ে বৃষ্টির পানিতে তাল মিলিয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে এগিয়ে যাচ্ছি।

একটা রাত আর একটা দিনের সুখস্মৃতিগুলো পেছনে ফেলে এবার ফেরার পালা। টানা বৃষ্টি পড়ছে। যদিও বৃষ্টি আমাদের ভ্রমণের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, তবে পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়েছে। মাওয়া ঘাটে বসে সময় গুনছি কখন ফেরি আসবে। বিভিন্ন চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজ চলছে– 'পায়রা ঘাট ভেঙে দশ হাজার গ্রামবাসী পানিতে প্লাবিত।' টানা বৃষ্টিতে ফেরি নোঙর করলেও কাউকে উঠতে দেয়া হচ্ছে না। তিন নম্বর বিপদ সংকেতের কথা কিছুক্ষণ পরপরই প্রচার করা হচ্ছে। বাতাস ও বৃষ্টির যুগলবন্দিতে একটা ভালোই সংকট তৈরি হয়েছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধরা খুবই ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। কেউ কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অতিরিক্ত ভাড়া মিটিয়ে স্পিডবোটে করে নদী পার হচ্ছে। নদীর পানির ঢেউ সাগরের পানির ঢেউয়ের চেয়ে বড় আকারে পাড়ে আছড়ে পরছে। নাহ্ কোনো সম্ভাবনাই নেই

অবস্থা অনুকূলে আসার। ভ্রমণে পঞ্চপাণ্ডবের রূপ ধরলেও আমরা সাধারণ মানুষই। সাজ্জাদ মাঝে মাঝেই তার এক বন্ধুকে ফোন করে ফেরির খোঁজ-খবর নিচ্ছে। কখনও তার কথায় আশার আলো খুঁজে পাই আবার কখনও হতাশ হই। তিন ঘন্টা হয়ে গেল, তারপরেও প্রতিকূল অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। তারপরেই জানা গেল পাটুরিয়া, মাওয়া, সদরঘাট সবখানে বৈরী আবহাওয়ার কারণে নদী পারাপারে সাময়িক বিরতির আদেশ জারি করা হয়েছে।

– মাহমুদ ভাই, নদী তো পার হইতে হইব।
– সেটা তো বুঝছি সাজ্জাদ ভাই, কিন্তু ক্যামনে?
– আমি অত কিছু বুঝি না, নদী পার হইতে হইব।

অন্য সময় হলে আমি হয়তো দুষ্টুমির ছলে বলতাম– চল সাঁতার দেই।
অবস্থাটা এতই ভয়ানক আকার ধারণ করেছে যে দুষ্টুমি করা যাচ্ছে না। জাহাঙ্গীর ভাই, সবুজ ভাইয়ের কপালে ছয়-সাতটা দুশ্চিন্তার ভাঁজ লক্ষ্য করলাম। সবুজ ভাই একটু পর পর চশমা কপালে তোলে, আবার চোখে দেয়। সবকিছু মিলে আমরা দ্রোনাগিরি পর্বতের মতো স্থির হয়ে গেছি। শামুকের গতিটাও যেন আমাদের হারিয়ে গেছে। কী করা যায় এই নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আমরা রাজবাড়ি-কুষ্টিয়া হয়ে যমুনা ব্রিজ দিয়ে ঢাকা ফিরব। আমরা রথ সারথীকে বলার সাথে সাথেই রফিক ফিরতি পথের জন্য ঘুরে দাঁড়াল। আবারও যাত্রা শুরু হলো। পাংশা মোড়ে আসার পরই আরেক বিপত্তি ঘটল। বিশাল একটা গাছ রাস্তার উপর শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ইলেকট্রিক স্তম্ভে কিছুক্ষণ পরপরই আগুনের ফুলকি উল্কার মতো ছুটছে। আর উপায় নেই। সবাই ভীষণ হতাশ হয়ে রথ ঘুরিয়ে একটি চায়ের দোকানে দাঁড়ালাম। কারও মুখে কোনো শব্দ নেই।

বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি খুবই সাধারণ মনে হলো। এত মানুষের ভোগান্তিতে তাদের কোনো বিকার দেখা গেল না। আমরা চা খেতে খেতেই জানতে পারলাম পাটুরিয়া ঘাটে একটা পন্টুন ছিঁড়ে উড়ে গেছে। নদীর নাব্যতা সংকটের কারণে প্রতি হেমন্ত ও শীতকালে ফেরি চলাচলে যথেষ্ট বাঁধা বিপত্তি ঘটে। সময়মতো ড্রেজিং না করা বন্দর কর্তৃপক্ষের অবহেলার চরম এক পরিচয়। ফেরিঘাটে লম্বা সময় ধরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে চানাচুর, মুড়িমাখা আর সেদ্ধ ডিম খাওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। বেড়িবাঁধগুলো সময়মতো মেরামত করা, ফেরির ইঞ্জিন, স্থাপনাগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ করে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও অনেক জরুরি। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এলোপাথাড়ি ভাবনায় হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম।
– কোথায় যাবেন?
– জ্বী!
– কোথায় যাবেন?

– নদী পার হতে হবে।
– এ আর কী সমস্যা! কথা কমু? আমার লোক আছে। নদী পার কইরা দেবে।
– ভাই আমাদের আর বাণী দিয়েন না, আর ভালো লাগে না।
– আপনার গাড়ি তো ছোট, বের করে দেয়া যাবে।
– কীভাবে?
– দুই-তিনশত টাকা দিতে হবে পাটুরিয়া ঘাটে।
ভদ্রলোকের নাম ফারুক। মাঝবয়সী মোটাসোটা, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পেশায় ছোট গাড়ির ড্রাইভার। লুঙ্গি গেঞ্জি পরা, বেঞ্চে বাম হাতের উপর হেলান দিয়ে ডান পা'টা বেঞ্চের উপর তুলে দিয়ে আরাম করে চা খাচ্ছে। রাত ১০টা বেজে গেছে। রাস্তার পাশেই দোকানটি। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি তখনও থামেনি। এত রাত্রে কী কারণে আগ বাড়িয়ে সহযোগিতা করতে চাচ্ছে তারও কোনো কারণ বুঝতে পারছিলাম না। বিষয়টা নিজে নিস্পত্তি না করে বাকি পাণ্ডবদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এরপর দলবেঁধে এগিয়ে গেলাম এই আশায়, যাতে প্রদীপ শিখার শেষ আলোটা দপ করে জ্বলার আগেই নিভে না যায়। ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললাম। উনি কাকে যেন ফোন করলেন– ভাই আমার কয়টা ভাই ব্রাদার ঢাকায় যাবে। দুই-তিনশ টাকা দিব। ছোট ফেরি কইরা নদী পার করে দিয়েন। ধন্যবাদ ভাই।
আমরা তখনও ঠিক ভরসা রাখতে পারছিলাম না। আদৌ কি সম্ভব নদী পার হওয়া! কী করি! আবারও প্রসঙ্গ উঠল আমরা কি তাহলে মাগুরা-কুষ্টিয়া হয়ে ঢাকা যাব, নাকি পাটুরিয়া দিয়ে।
– সারথী, রথ টানো পাটুরিয়ার দিকে।
হঠাৎ করেই সবুজ ভাই চিৎকার করে উঠল।
এরপরেও অনেক জল্পনা, কল্পনা, যানজট ঠেলে আমরা ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ছোট একটি ফেরিতে উঠতে পারলাম।
শেষ পর্যন্ত নদী পার হতে পারছি, এই ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পঞ্চপাণ্ডব।

সুদূর আমেরিকায়

সুলতান উদ্দিন আহমেদ
প্রাক্তন ম্যানেজার
জুনিপার এমব্রয়ডারিজ লিমিটেড

বাসা থেকে বের হয়ে সবুজ পাতায় ভরা প্রকাণ্ড উঁচু গাছটার নিচে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। রাত প্রায় শেষ। চারদিক নীরব। মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগে। হাতে সময় কম। দ্রুত বিমানবন্দর পৌঁছাতে হবে। আবছা অন্ধকারে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলি– বাবা, আমরা আসি। আস্তে আস্তে গাড়ি এগুতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি-ঘর গাছপালার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেকে আর দেখা যায় না।

মনে পড়ে, এইতো সেদিন আমাদের অপর পৃষ্ঠে সুদূর আমেরিকায় আমার ছেলে আছিফের সেন্ট ক্লাউড স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্রাজুয়েশন শেষে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী ইয়াসমিন বাংলাদেশ থেকে রাত নয়টায় এমিরেটস এয়ার লাইন্সে রওনা হই। রাত দুইটার সময় দুবাইয়ে, দুই ঘন্টার যাত্রা বিরতি এবং প্লেন বদল হয়। দুবাই বিমানবন্দর অনেক বড়। নির্দিষ্ট গেট দিয়ে আমেরিকায় যাওয়ার প্লেনে উঠার জন্য যাত্রীদের সাথে হাঁটছি তো হাঁটছিই। লম্বা পথ আর কিছুতেই শেষ হয় না। অবশ্য কোথাও কোথাও চলন্ত মেঝে, তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে থাকলেই কিছুদূর এগোনো যায়। বিশাল বিশাল স্টলে বিক্রির জন্য রয়েছে ইলেকট্রনিক্স, কসমেটিক্স ইত্যাদি নানা প্রকার আকর্ষণীয় জিনিসপত্র। অবশেষে এমিরেটস এয়ার লাইন্সের বিশাল সুপ্রশস্ত প্লেনে চড়ি। সুন্দর চেহারার এয়ার হোস্টেসগণ মিষ্টি হেসে কথা বলেন। আমাদের গরম জলে ভেজা টাওয়েল দেন। আমরা হাত-মুখ মুছে কিছুটা ফ্রেশ হই। ড্রিংকস ও নানা প্রকার সুস্বাদু খাবার খেয়ে আসনটাকে পেছনে ঠেলে নামিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙার পর জানালা দিয়ে দেখি সূর্যের আলো। হাঁটতে হাঁটতে বিমানের সম্মুখভাগে একটু খালি জায়গায় এসে হাত-পা নাড়াচাড়া করে হালকা ব্যায়াম করি। একপাশে জানালার কাছে গিয়ে দেখি তুলার মতো সাদা মেঘমালা সমুদ্রের নীল জলের উপর ভাসছে। প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে এখন আমরা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছি।

অবশেষে প্রায় দুই হাজার মাইল উড়ে এসে মেঘমুক্ত রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল নয়টায় আমাদের প্লেন নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমেরিকার মাটি স্পর্শ করে। সকলের সাথে আমরাও প্লেন থেকে নেমে আসি।

ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস চেক সেরে আমেরিকায় ঢোকার সর্বশেষ বাঁধা পার হয়ে বুকের ভেতর জমানো বাতাস ছেড়ে দিয়ে দ্রুত বিমানবন্দরের বাইরে আসি। ঝকঝকে তকতকে সুপ্রশস্ত সমতল রাস্তায় দ্রুতবেগে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। শত শত গাড়ির স্রোত অথচ কেউ কারো পথ আটকিয়ে যানজট সৃষ্টি করছে না। কোথাও যদি আড়াআড়ি পথ থাকে সেখানে পুলের মতো একটা পথ যায় আরেকটির উপর দিয়ে। গাড়ির হর্ন বাজিয়ে কেউ কাউকে বিরক্ত করে না। রাস্তায় কোনো মানুষের পদচারণা নেই। পথের দুই দিকে সারিবদ্ধ অজানা সবুজ পাতায় ভরা গাছপালা, পাহাড়, জঙ্গল। মাঝে মাঝে নানা রঙের ফুলের বাগানের মধ্যে ছবির মতো বাড়ি-ঘর চোখে পড়ে। কোথাও ময়লা বা ধুলোবালি নেই। পরিষ্কার নির্মল বাতাসে দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি-অবসাদ দূর হয়ে যায়।

আছিফের বন্ধু মেরি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে লেখাপড়া করে। আমাদের প্রতি তার অনেক মায়া। সে প্রায় চার ঘন্টা গাড়ি ড্রাইভ করে আমাদের তার বাবা-মার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। দুই ঘন্টা হাইওয়েতে চলার পর রাস্তা ছাড়িয়ে একটু ভিতর দিকে গাড়ি থামানো হলো। নানা রঙের ফুলের বাগান আর সাজানো সবুজ গাছপালার ছায়ায় বিশ্রামের জায়গা। কেউ কেউ গাড়ির ভিতর একটু ঘুমিয়েও নিচ্ছে। এখানে সুন্দর পরিষ্কার বাথরুমে পর্যাপ্ত টয়লেট টিস্যু ও পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। মেরির বাবা মিস্টার ডেভিড স্মিথ একজন সুদর্শন, ভদ্র ও বিনয়ী ব্যক্তি। ড্রয়িংরুমে বিখ্যাত গায়ক জর্জ হ্যারিসনের গাওয়া দি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ রেকর্ডটি দেখতে পাই। একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি যুবক ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য তিনি এই লং প্লেটি ক্রয় করেছিলেন। এতদূর দেশ থেকে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার এত ভালোবাসা দেখে আমি তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমেরিকানদের খাবার খেতে আমাদের অসুবিধার কথা ভেবে তিনি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেইসাথে অনেক আতিথেয়তা করেছেন।

আমেরিকায় এখন সামার, বেড়াবার উপযুক্ত সময়। আমেরিকার স্বাধীনতার স্মারকস্তম্ভ স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখার জন্য একদিন সকালে পাতাল ট্রেনে চড়ে চলে আসি ম্যানহাটনের ফেরিঘাটে। টিকিট কেটে কড়া নিরাপত্তা চেকিং সেরে বিশাল জনস্রোতের সাথে দোতলা জাহাজে উঠি। জাহাজ যখন ছাড়ল তখন সমগ্র নিউইয়র্কের বিশাল সব দালানকোঠা এক নজরে দেখতে পেলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সবুজ গাছপালায় ঘেরা নিরিবিলি সুন্দর ছোট্ট দ্বীপে নামি। নানা রঙের ফুলের বাগানে সবুজ ঘাসের উপর বসার জন্য কাঠের বেঞ্চ

রাখা আছে। এক পাশের দেয়ালে লেখা আছে স্ট্যাচু অব লিবার্টির নানা ইতিহাস। ফ্রান্স আমেরিকাকে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ উপহার দিয়েছিল ঝকঝকে লালচে রঙের তামার পাতে তৈরী বিশাল নারী মূর্তিটি। এটি প্রথমে খণ্ড আকারে অনেকগুলো বাক্সে ভরে এখানে আনা হয়েছিল। পরে জোড়া দিয়ে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছে। ভিত থেকে এর উচ্চতা প্রায় তিনশত ফুট। এর ডান হাতের মশাল হলো জ্ঞানের শিখা এবং বা হাতের বই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতীক। দর্শকদের জন্য টিকিট কেটে এলিভেটরে করে স্ট্যাচু অব লিবার্টির মাথা পর্যন্ত ওঠার ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখে আবার সেই বিশাল জনস্রোতের সঙ্গে দোতলা জাহাজে করে ফেরা হলো।

ম্যানহাটনে এক সময় আমেরিকার আদিবাসি রেড ইন্ডিয়ানদের কিছু কুঁড়েঘর ছিল। এখন সেখানে শত শত আকাশচুম্বি অট্টালিকা। সেখানে দেখেছি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংস্থা জাতিসংঘ ভবন। জাতিসংঘের সদস্য দেশ এখন একশত তিরানব্বইটি। প্রতিজন দশ ডলারের টিকিট কেটে উঠেছি ১০২তলা উঁচু এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের উপরে। এত উঁচু থেকে দূরবীন দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত চারদিকে দেখা যায়। ঘুরতে ঘুরতে এবার আমরা আসি যেখানে ধ্বংস করা হয়েছিল টুইন টাওয়ার খ্যাত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। পাশাপাশি ১১০তলা দু'টি আকাশচুম্বি অট্টালিকা যা আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নকল্পে নির্মাণ করা হয়েছিল। বড় বড় বিলবোর্ডে টুইনটাওয়ারে কর্মব্যস্ততার ছবি এবং নানা তথ্য দেওয়া আছে। অফিস চলাকালীন টুইনটাওয়ারে দৈনিক পঞ্চাশ হাজার কর্মচারী কাজ করত। এই কমপ্লেক্সের বেজমেন্টে দুই হাজার গাড়ি পার্ক করা যেত। ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে এখন সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে দুইটি বড় বড় চারকোণা পাকা গভীর গর্তের ভিতর চতুর্দিক থেকে অনবরত পানির ঝরনাধারা। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসে এখানে। ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে যারা মারা গিয়েছিল তাদের স্মরণে এই ঝরনা দু'টির চতুর্দিকে কালো স্টিলের পাতে খোদাই করে তাদের নাম লিখা আছে। আত্মীয়-স্বজনরা এসে নামের পাশে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। প্রখর রোদের মধ্যে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। একটি কথা প্রচলিত আছে আমেরিকায়– ওয়ার্ক, ওয়াইফ এবং ওয়েদার এর কোনো ঠিক নেই। কিছুটা পথ ভিজতে ভিজতে দ্রুত গাড়িতে গিয়ে উঠি।

নিউইয়র্কের চিড়িয়াখানা অনেক বড়, ঘুরে দেখার জন্য গাইডসহ গাড়িরও ব্যবস্থা আছে। এখানে জীবজন্তু আছে খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশে। কোথাও কোথাও সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে কিছুদূর চলার পর কাঁচে ঘেরা নিরাপদ ঘর থেকে দেখা যাবে ভয়ঙ্কর সব প্রাণী। এখানকার বিরাট জাদুঘরে ডাইনোসরের বিশাল আকৃতির কঙ্কাল ও ডিম রাখা আছে। জুরাসিক পার্ক সিনেমায় দেখেছিলাম এসব ভয়ঙ্কর ডাইনোসরেরা কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে কত দাপটের সাথে বসবাস করত। এখন সারা পৃথিবীতে তাদের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আমেরিকা সম্পদশালী ভাগ্যবানদের জন্য স্বপ্নের দেশ। আবার ভাগ্যহারা নিঃস্ব মানুষের স্বপ্নভঙ্গের দেশ। আকাশচুম্বি অট্টালিকার পাদদেশে গৃহহীনদের দেখেছি ফুটপাতের ধার ঘেঁষে কম্বল গায়ে শুয়ে শীতে কাঁপছে। তাদের মধ্যে সাদা অথবা কালো উভয়েই ছিল। পথে চলতে, চলন্ত ট্রেনে বা মার্কেটে খোলামেলা পোশাকে নারী-পুরুষদের জড়িয়ে ধরা বা চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখে বেশ লজ্জায় পড়তে হয়েছে।

কী সৌভাগ্য আমার! দুনিয়ার স্বর্গ বিশাল আমেরিকায় দর্শনীয় কতকিছু দেখা হলো, অজানা থেকে গেল আরো অনেক কিছুই। ভ্রমণ শেষে আমাদের ফেরত যাত্রায় হাইওয়েতে মসৃণ রাস্তায় উল্কার বেগে গাড়ি ছুটতে থাকে। পথের দুই দিকে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ফসলের ক্ষেত দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভাসতে থাকে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা আমার ছেলে আছিফের স্থিরনয়ন ম্লান মুখখানি।

নীলাদ্রি

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
সিনিয়র ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

মিল্কভিটা– টেক্সটাইলের ঢালু রাস্তাটা মিছিলের মতো চলমান থাকে সকাল এবং রাতের কিছুটা সময়। একেবারে মৌন নয় কিন্তু স্লোগানবিহীন। মিছিলের শত শত জোড়া পা দ্রুত তালে ধাবমান। রাষ্ট্র কিংবা সমাজ অথবা অধিকার উদ্ধারে তাদের কোনো আপাত দাবী নেই। প্রয়োজন শুধু আজকের দিনের হাজিরাটা, ওভারটাইমসহ। পায়ে পায়ে ধুলোর কুয়াশা ওঠে। রাতে আরেকটা ফিরতি মিছিলের গতিও নেহায়েত কম নয়। ধুলো উড়ে দুই পাশের আবাসিক বাড়ির মাথা অব্দি পৌঁছে যায়। এই মানব মিছিলে হঠাৎ ঢুকে পড়া প্রায় গতিহীন গাড়ির প্রলম্বিত লাইটে সচল পা গুলোকে একই তালে গাঁথা একটা কবিতার মতো মনে হয়। সারাদিনের কর্মক্লান্ত অজস্র শরীরের ঘামের গন্ধ রাস্তা ছাড়িয়ে আশেপাশের গলিতেও ঢুকে পড়ে। রাস্তার পাশের ভ্যানের উপর হরেক রকম সবজি সাজিয়ে বসা সবজিওয়ালারা দশ টাকা, বিশ টাকা, পনেরো টাকা ডাকতে ডাকতে কেজি কেজি সবজি বিক্রি করে। চলমান মিছিল থেকে বেরিয়ে পড়ে দ্রুত কিছু সবজি কিনে আবার মিছিলে ঢুকে পড়ে কেউ কেউ। এদের বেশিরভাগই সুমি মনোয়ারা ফুলমতি আয়েশারা; রহিম আকাশ শাহজাহানরাও আছে তবে সংখ্যায় কম। বাজারের পঞ্চাশ টাকা কেজির সবজি এখানে বিশ টাকায় মেলে, চল্লিশ টাকারটা পনেরো টাকায়।
না হলে কী করে চলত ওদের!

টানা দু'দিন ধরে একতালে বৃষ্টি নামছে। মনে হয় আকাশটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফুটো করে দিয়েছে কেউ। কারখানা ফেরত মিছিলের সহযোদ্ধারা কাকের বাচ্চার মতো ভিজে চুপসে গেছে। মাঝে মাঝে মিছিলের ভেতরে অনাহুতভাবে ঢুকে পড়া গাড়ির হেড লাইটে মানব মানবীগুলো চিকচিক করছে। সুমি এই মিছিলের নিত্য সহযাত্রী। অকাল বৃষ্টির হিম হিম বাতাসে ওর মনটা আজ একটু অন্যরকম। একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'হাতে চুল খুলে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর ফেলে আসা গ্রাম নেকমরদের কথা মনে পড়ে। ও যেন সেই

ঘাসের রাস্তায় ছপ ছপ শব্দ করে হেঁটে যাচ্ছে। আরেকটা গাড়ির লাইটে ওর সমস্ত শরীরে একটা অপার্থিব শেড তৈরী হয়।

রূপনগরের ৪ নম্বর লাইনের যে রুমটাতে সুমির আবাস তা ওর একার নয়। মাসিক সাড়ে তিন হাজারের এই রুমে একা থাকার দুঃসাহস কোথায়! এরকম সাতটা রুমের এই আবাসিকের দুইটা চুলায় আটাশজনের উদরের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে প্রতিদিনই কিছু খণ্ডযুদ্ধ হয়। প্রলয়ংকরী বন্যায় মানুষ আর পশুপাখি যেমন শেষ অব্দি নিঃশর্ত সহ-অবস্থান মেনে নেয় ওরাও তেমনই। সমস্যা হয় নতুন কেউ এলে। এতগুলো মানুষের জন্য দু'টো টয়লেট মাঝে মাঝে অনাকাঙ্খিত অবস্থা তৈরী করে। রুমে চারজনের জন্য একটা ফ্যান ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়। গরমের দিনে আবদ্ধ ঘরে লোডশেডিংয়ের সময় সেদ্ধ হতে থাকা চারটা মানুষ অঘোরে ঘুমায়। চুলার অধিকার পেতে হলে ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। আছে টয়লেটের অধিকারের যুদ্ধ। রাতে এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে করতে কখনো বারোটা কখনো একটা বেজে যায়। জানালা খুলে একটু শীতল হয়ে ঘুমাবে সে সাধ্য কোথায়! বরুণ হাজী, ফজর আলীদের লালিত সন্তানেরা জানালার গ্রিল দিয়ে মাথার নিচের বালিশটাকেও টেনে নিতে পারে। রাষ্ট্র যেখানে পৃষ্ঠপোষক, ওদের আর ভয় কিসে? মাঝে মাঝে কারখানা ফেরত মিছিল থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সুমি, আয়েশাদের উপর অশ্লীল আচরণ করে হারামজাদাগুলো। ঢালের রাস্তার একেবারে শেষদিকে রাস্তার পাশের কয়েকটা গাছ কিছুটা অন্ধকার তৈরী করেছে। কোনো অজানা কারণে এখানকার ল্যাম্পপোস্টের বাতিটা নষ্ট থাকে প্রায়ই। হারামজাদাগুলো নানারকম কৌশলে কারখানার ছেলেমেয়েগুলোর আয়-রোজগার, মোবাইল, ব্যাগগুলো আপন সম্পদ মনে করে হাতিয়ে নেয়। আরো কিছু বায়না করে সুমিদের কাছে। পাড়ার সিকিউরিটি গার্ড আর ডাকসাইটে বাড়িওয়ালারা কিছুই বলে না। অদূরের থানার পুলিশেরাও সব হীরক রাজার সেপাই।

সুমির আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। টানা বৃষ্টির একটানা শব্দে নেকমরদের বৃষ্টিরাতের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে শৈশবে দেখা স্বপ্নগুলোর কথা– স্বচ্ছল শৈশবে যেরকম স্বপ্ন দ্যাখে মানুষ। অকালে পিতৃহীন হবার পর স্বপ্নহীন সংগ্রামী সময়ের কথা তার মাথার চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে। অসুস্থ মায়ের মুখ চোখে ভাসে। মা বলতেন,

-তুই খুব বড় ঘর পাবিরে মা, তোর স্বামী তোরে খুব ভালোবাসবে, আদরে-সোহাগে রাখবে।

-তুমি ক্যামনে বুঝলা?

-বুঝিরে মা বুঝি, মা হলে সবই বুঝতে হয়। তোর নাকের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমলে আমার যে বড়ই সুখ হয় রে মা!

মায়ের সাথে তার শৈশব কৈশরের সব কথাগুলো মনে পড়ে। বাবার কথা মনে হলে ডুকরে কান্না আসে। বিছানায় বসে পড়ে কান্না থামাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

ভাবনাগুলো ডালপালা মেলতে মেলতে তার বিবাহিত জীবনের দুইটি বছরের স্মৃতিকেও টেনে আনে। অপরিণত বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। পিতৃহীন অভাবের সংসারে মেয়ের নিরাপত্তা মায়ের কাছে খুব বড় ব্যাপার। মা চেয়েছিলেন মেয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর একটা নিরাপদ ঠিকানা, সব মায়েরাই যা চেয়ে থাকেন। ছেলেটা দেখতে শুনতে মন্দ না, বাবার সহায় সম্পত্তিও আছে বেশ। বাড়ি ঘরের অবস্থাও ভালো। সুযোগটা হাতছাড়া করেননি সদ্য স্বামীহারা সুমির মা। সুমিও আপত্তি করেনি খুব একটা। জীবনের বাস্তবতা বোঝার মতো বয়স হয়েছে তার। সমস্যাটা হলো বিয়ের পর, যেমনটি হয়ে থাকে।

ছেলেটা কাজকর্ম করতে চাইত না। মৃত মানুষের কবর খোড়া তার এক রকম নেশা ছিল। দশ গ্রামের যেখানেই কেউ মারা যেত সেখানেই খবিরউদ্দিন হাজির। সবাই ওকে গোরখোদক হিসেবেই চিনত। একটা আধ্যাত্মিক ভাব ভর করল খবিরউদ্দিনের কাজ-কর্মে। সুমির সাথে কথাবার্তা হতো না খুব দরকার না পড়লে। রাতে আদর-সোহাগ, ভালোবাসার পরিবর্তে গহীন কবরের নিরস গল্পগুলো সুমির খুব একঘেয়ে লাগত। কবরের ভেতরের বিশাল বিশাল অজগর, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের শিখা, বিচ্ছু, পোকামাকড়ের একই রকম কাহিনীগুলো সুমির জন্য দিনে দিনে অসহ্য হয়ে ওঠে। তারপর একদিন আধ্যাত্মিক খবিরউদ্দিন আর চঞ্চল সুমির চিরন্তন সংঘাতে বিয়েটা ভেঙে যায়।

বাকি রাতে আর ঘুম হলো না সুমির। রাতের বৃষ্টি এখনো থামেনি। টিনশেডের রুমগুলোর সবাই উঠে পড়েছে। চুলা আর টয়লেটের অধিকার পাবার লড়াইয়ে হেরে গেলে মুশকিল। ৮টার পর অফিসে ঢুকলে হাজিরা বোনাসটা মিলবে না। এ মাসে কিছু বাড়তি টাকা পাঠাতে হবে মায়ের চিকিৎসার জন্য। একটু পরে কারখানাগামী মিছিলে শরীক হবার জন্য তৈরি হওয়া খুব জরুরি। আজ একটা পরীক্ষা হবে অফিসে। ভালো করতে পারলে একটা প্রমোশন হতে পারে।

ইদানিং গাছের নিচের বখাটে ছেলেগুলো অতিরিক্ত উৎপাত শুরু করেছে। কারখানার সবার ছুটি একসাথে হয় না। গুরুত্বপূর্ণ প্রসেসের কিছু কর্মীকে অতিরিক্ত সময় থাকতে হয়। সুমি ঐ গুরুত্বপূর্ণদের একজন। সেজন্য বাড়ি ফেরার মিছিলটা ধরতে পারে না প্রায়ই, আজও পারেনি। এত রাতে বাসায় ফেরাটা ঝুঁকিমুক্ত নয়। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাই ওরা দল বাঁধে। দল বড় হলে সাহসটা বেড়ে যায়। পাঁচজনের একটা দল আজ একসাথে বাসার দিকে পা বাড়ায়। সুমির সাথের সহকর্মী দু'জন ছেলে আর দু'জন মেয়ে। চলার গতি মিছিলের মতোই। ওরা এই গতিতেই অভ্যস্ত। অনেক দিনের অভ্যাস ওদের, যদিও উন্নতির

গতি সমানুপাতিক নয়। গাছের অন্ধকার এলাকাটা পার হওয়ার সময় রাস্তার পাশের চারজনের একটা জটলা থেকে একজন ডাক দেয়–

-এই খাড়া, এত রাইতে মাইয়া নিয়া কই গেছিলি? ফস্টি নস্টি করার জায়গা পাও না।
সুমিদের দলটা থমকে দাঁড়ায়। দলের একটা ছেলে প্রতিবাদ করে।

-বাজে কথা কন ক্যান। আমরা একসাথে কাজ করি। দেরিতে ছুটি হইছে, তাই একসাথে যাইতেছি। দরকার হলে আইডি কার্ড দ্যাখেন।

-হালায়তো দেহি আবার তর্ক করে। কথা কইলে একদম ফাইড়া ফালামু। তোগোর মোবাইল দে।
সুমির সাথে থাকা ছেলে দুইটা ইতস্তত করে।
-হালার সাহস কত! এই তোরে মোবাইল দিতে কইলাম না?

ছেলেদুটো পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেয়।
মোবাইল ঘেটে কী যেন বের করে গুণ্ডাদের একজন।

-তোর মোবাইলে মাইয়া মাইনষের ছবি ক্যান? শালা লুইচ্চামি করো, না? মফিজগুলা মহল্লাডারে নষ্ট কইরা দিলো। কোনো কথা কইলে খবর আছে। একদম সোজা ভাগবি। এই মহল্লায় যেন আর কোনোদিন না দেহি।

ওদের হাতের ছুরিগুলো চক চক করতে থাকে। চিৎকার করে কোনো লাভ নাই। সুমিরা হাঁটা শুরু করে।

-এই তুমি কই যাও, সুমির দিকে ইঙ্গিত করে যে ছেলেটা হাক ছাড়ে ওর নাম কামাল।

-ওরা যাক, তুমি খাড়াও। তোমার লগে আমার কথা আছে। তোমার নাম্বার দাও আমি রাইতে কথা কমু। ফোন না ধরলে খবর আছে।

সুমি দেখতে পেল ওর সাথের সহকর্মীরা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই পোলাগুলো যে রকম খারাপ ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারে।
সুমি বিড় বিড় করে ওর নাম্বার বলে।

-ভুল হইলে খবর আছে কইলাম। এইবার যাও, যেমনে কমু হ্যামনে চলবা। নাইলে এইহানে থাকতে পারবা না।

সুমির সহকর্মীরা ভয় পেয়েছে খুব কিন্তু কেটে পড়েনি। একটু দূরের দুয়ারি পাড়ার রাস্তায় ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই জায়গাটাতে মানুষের কিছু আনাগোনা এখনো রয়েছে। এখান থেকে দুই গলি পরেই সুমির বাসা। দোকানপাটগুলো বন্ধ হবার জন্য গোছগাছ শুরু

করেছে। কিছু কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। সুমিরা যে মুদি দোকান থেকে কেনাকাটা করে ঐ দোকানটা খোলা আছে এখনো। রশীদ ভাইয়ের দোকানের সামনে মিনিট দশেক পরে সুমিও এসে হাজির হয়। একে অপরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওরা। চোখেমুখে হতাশা-ক্ষোভ-বিস্ময় ওদেরকে নির্বাক করে রেখেছে। রশীদ মিয়া দোকান বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার দোকানের নিয়মিত খদ্দেরদের এরকম অসহায় চোখগুলো তার নজরে আসে না। আরো কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে উঠলে সুমি বলে,

-যা তোরা, বাসায় যা। কাল সকালে আবার অফিস আছে। উপরে একজনতো আছেন, উনি বিচার করবেন।

-ওরা তোমারে কিছু কয় নাইতো বুবু! তোমার কোনো ক্ষতি করে নাই তো?
রেশমা জিজ্ঞেস করে। বাকিরা তাকায় উদ্বেগ আর কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে।
-না, আমার কিছুই হয় নাই। তোরা যা, ঘুমা গিয়া।

ওদেরকে বিদায় দিয়ে রশীদ ভাইয়ের কাছ থেকে দু'টো ডিম, আধা কেজি লবন কিনে বাসার গলিতে পা বাড়ায় সে।

আজ আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টিনের চালে একটা ছন্দ উঠেছে। কখনো দ্রুতলয়ে, কখনো ধীরে– ছন্দের উঠানামা চলছে। সুমির মাথার ভেতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার আগে তার পেটে যে উদগ্র ক্ষিদের আনাগোনা ছিল তা কোথায় যেন উধাও এখন। রশীদের দোকানের ডিমটা আর ভাজার ইচ্ছে নেই তার। সারাদিনের ক্লান্তির অবসাদ তার চোখে-মুখে-শরীরে, অথচ একটুও ঘুম আসছে না। ভীষণ বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে। কৈশরের নেকমরদের কথা মনে পড়ছে সুমির। নেকমরদের আকাশে অঝোর বৃষ্টি নামছে। ঘাসের আলপথে হেঁটে যাচ্ছে একজন কিশোরী। তার চুল খোলা, ঘাসের উপর ছপছপ শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির পানি সবুজ ঘাসের উপর উপচে পড়ছে। অদূরের বাঁশবাগান ঝাপসা হয়ে গেছে বৃষ্টি বাতাসে। একটা কিশোরী, তার গায়ে টকটকে লাল জামা, সবুজ মাঠের ভেতরে দু'হাত প্রসারিত করে দৌড়াচ্ছে। একটা কালো আর একটা লাল গরু ঠায় দাঁড়িয়ে ডেকে ডেকে যাচ্ছে। শীতল বাতাসের ঝাপটা এসে কিশোরীর শরীরের উপর কোমল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই কামাল ছোকরাটা আগেও কম জ্বালায়নি সুমিকে। গত ছয়মাসের বেশি হলো ঐ পথে আসার সময় প্রায় দিনই তার শকুনের দৃষ্টি দেখেছে সুমি। মাঝে মাঝে তার বাসা পর্যন্ত পিছু নিয়েছে ছেলেটা, কিন্তু আজকের মতো দুঃসাহস দেখায়নি আগে। আজ একটু বেশিই নিরিবিলি হয়ে পড়েছিল রাস্তাটা। টানা বৃষ্টির দিনগুলোতে ঢাকার মানুষ একটু আগেই ঘরে ফিরে যায়।

এখন কী করবে সুমি? এই শহর ছেড়ে কৈশরের নেকমরদে ফিরে যাবে? গোরখোদক খবিরউদ্দিনের সাথে নিস্তব্ধ কবরের ভিতর দুই বছর সংসার করার সময় তার প্রায়ই দম আটকে আসত। মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করত। আজও তার দম আটকে আসছে খুব। নানান ভাবনাগুলো জড়ো হয়ে মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বখাটে কামাল যদি তাকে তুলে নিয়ে যায় তাহলে কী করবে সুমি!

রাত এখন দেড়টা। সুমির রুমে আজ কেউ নেই। ওর রুমমেটদের কারখানায় নাইট ডিউটি আছে। কিছুক্ষণ ধরে ফোনটা একটানা বেজে চলেছে। ঐ শয়তানটা মনে হয়। সুমি ফোনটা ধরার সাহস করতে পারে না। আবার দুঃসাহস করার সাধ্যও নেই। কাল আবার যেতে হবে ঐ পথেই; ওই চাকুধারী ষণ্ডাদের বুকের ওপর দিয়ে।

কামাল প্রায় রাতেই ফোন করে এখন। ওর রুমমেটরাও জানে ব্যাপারটা। সুমি সবই বলেছে ওদের। ছেলেটা দেখতে তো খুব সুন্দর কিন্তু গুণ্ডামি করে ক্যান? গুণ্ডামি না করলে কিন্তু তোমার সাথে খুব মানাইতো আপা– রুমমেট নিপা বলে।

ইদানিং কামালকে আর দলের সাথে দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সুমির অফিসের সামনে ছুটির সময় দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। শকুনের দৃষ্টি কীভাবে যে হরিণের মায়া চাহনিতে রূপ নিল তার কোনো কূলকিনারা করতে পারে না সুমি। এই পরিবর্তনের পেছনে কোনো ফন্দি আছে কিনা সে প্রশ্নও তার মাথার ভেতর ধান্দা লাগায় মাঝে মাঝে। মনে পড়ে, যেদিন মধ্যরাতে গাছের ছায়ার অন্ধকারে সুমির ফোন নম্বর নিয়েছিল কামাল, সেদিন ওর দলেরই একজন সুমির গায়ে হাত দিতে গিয়েছিল। খবরদার ওর গায়ে হাত দিবি না বলে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল কামাল ওর দলের ছেলেটাকে। এই সাত-আট মাসে ছুটির দিনগুলোতে বেশ কয়েকবার ঘুরতে বেরিয়েছে ওরা। অনেক সময় মধ্যরাত পর্যন্ত একসাথে সময় কাটিয়েছে। কখনোই ওকে নিয়ন্ত্রণহীন মনে হয়নি। ভালো হবার যে শর্তগুলো দিয়েছিল সুমি তার প্রায় সবই পূরণ করেছে কামাল। কী করে মানুষ এত বদলে যেতে পারে সে কথা ভাবতে ভাবতে সুমির খুব আনন্দ হয়। এই প্রথম নিজেকে খুব সার্থক মনে হয় তার।

গত চারদিন ধরে কামালের কোনো খবর নেই। মোবাইল ফোনটাও বন্ধ। সুমির সাথে সম্পর্ক তৈরি হবার পর এত দীর্ঘ সময় নিরুদ্দেশ থাকেনি কামাল। নানারকম শংকায় তার মাথা ঘুরতে তাকে। দুর্ভাবনার কোনো কূলকিনারা করতে পারে না ও। কামাল একবার বলেছিল– ৮ নম্বর লাইনের শেষ দিকের ১৩ নম্বর বাসায় থাকে ও। সুমিকে বেশ কয়েকবার বাসায় যাবার অনুরোধ করেছে কামাল, সুমি যায়নি।

কামালের বাসায় কেউ নেই, বিশাল একটা পুরোনো তালা ঝুলছে। পাশের বাসার সামনে একজন মধ্যবয়সী মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সুমি এগিয়ে গিয়ে কথা বলে। সুমি জানতে পারে ভালো হয়ে যাবার অপরাধে পুরোনো দলের লোকগুলো কামালকে ছুরি মেরেছে। সে এখন হাসপাতালে।

সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ৩য় তলার একটি রুমে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে কামাল। তার মুখে অক্সিজেন দেয়া। শরীরে অনেকগুলো ব্যান্ডেজ। এই চারদিনে শুধু একবার জ্ঞান ফিরেছিল, অল্প সময়ের জন্য। সুমি তার মাথার পাশে কপালে হাত রেখে সারারাত বসে থাকে। সমস্ত প্রার্থনা একসাথে উচ্চারিত হয় তার অন্তরে। রাত শেষ হয়ে আসছে। হসপিটালের পূর্ব দিকের গাছপালার আড়ালে সূর্য ওঠে রক্তের মতো লাল। হঠাৎ কামালের হাত নড়ে উঠলে একবার তার দিকে তাকায় সুমি। দ্যাখে, সেই চোখজোড়া ডাগর তাকিয়ে আছে সুমির দিকে। সেই চোখের গভীরে দেখতে পায়– একটা সবুজ মাঠ, মাঠজুড়ে বৃষ্টি নামছে। মাঠের ওপারে অসংখ্য নীল পাহাড় বৃষ্টিতে ভিজছে।

চিড়িয়াখানা

আল-মারুফী রহমান (স্বজন)
বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী
ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি-২০১৭

নরেন বাবুর আজকে ছুটি দিনটা শুক্রবার,
চোখে-মুখে ঝিলিক মারে আনন্দ আজ তার।
আজকে তিনি ঘুরতে যাবেন মিরপুর চিড়িয়াখানা,
দেখবেন কত পশুপাখি, যত তাদের ছানা।

এই না ভেবে নাকে-মুখে গুজে চারটি ভাত,
যত্ন করে পরেন তিনি সুন্দর একটা শার্ট।
কাপড়-চোপড় পরে বাবু রওনা দেন দ্রুত,
থোড়াই কেয়ার আজকে শুধু সকল রকম ছুতো।

মিরপুরের এক বাস দেখে দ্রুত উঠে পড়েন,
পিছনে এক ছোকরা বলে– এই যে দাদা সরেন।
সকাল বেলায় নরেন বাবুর মেজাজ গেল চড়ে,
ইচ্ছে করে চড় মেরে দেন কষে আচ্ছা করে।

কিন্তু বাসটা ক্লাস তো নয়, আর ছোকরাও নয় ছাত্র,
এইনা ভেবে নরেন বাবুর জ্বলে সারা গাত্র।
দুলতে দুলতে লোকের চাপে হয়ে চিড়েচ্যাপ্টা,
পকেট থেকে হারিয়ে ফেলেন চিড়িয়াখানার ম্যাপটা।

টিকেট কিনতে যান তিনি টিকেট কাউন্টারে,
আশেপাশের গাড়িগুলো কালো ধোঁয়া ছাড়ে।
টিকেট কেটে চিড়িয়াখানায় দ্রুত ঢুকে পড়েন,
কলার খোসায় পিছলা খেয়ে উল্টা হয়ে পড়েন!

আশেপাশের শিশুরা সব হাসে হি হি করে,
লজ্জায় এখন নরেন বাবু যাচ্ছেন বুঝি মরে।
ধুলোর মধ্যে নরেন বাবু খাচ্ছেন গড়াগড়ি,
মনে মনে বলেন তিনি, বাঁচাও, ও রাম, হরি!

ধুলো থেকে উঠে যান বাঘের খাঁচার দিকে,
আজ সবারে দেখিয়ে দেবেন, চাপড় মারেন বুকে।
বাঘের দিকে এগিয়ে গেলেন ফুলিয়ে বুকের পাটা,
হঠাৎ বাঘটা গর্জে উঠল, গায়ে দিলো কাঁটা।

গর্জন শুনে নরেন বাবু উল্টা ঘুরে দৌড়,
মনে হলো বাঘ এ-তো নয় মানুষ মাংসখোর!
নরেন বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, বাঁচাও বাঁচাও বাঘ!
চিৎকার শুনে বলল সবে, ভাগরে সবাই ভাগ!

বাঘ ব্যাটা বেরিয়ে গেছে ভেঙে লোহার খাঁচা!
সবাই ছুটছে গেটের দিকে আপনার জান বাঁচা।
নরেন হঠাৎ উস্টা খেয়ে উল্টা হয়ে পড়েন,
পায়ের চাপায় চ্যাপ্টা হয়ে দম ফেলতে লড়েন।

বলেন তিনি, চিড়িয়াখানায় আসব নাকো আর,
নাক ডলছি, কান মলছি, শিক্ষা হলো আমার।

জ্যোৎস্নারা উঁকি দেয়

মোঃ কবির হোসেন
জুনিয়র ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বুকের ক্যানভাসে আঁকা ছবিগুলো আজ
গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা।
শিশিরসিক্ত মেঠো পথ, কাশবন,
শরতের নির্মেঘ নীলাকাশ, ঝরাপাতা–
এখন আর মন ছুঁয়ে যায় না অনিমার,
কারণ- অস্তিত্বের লড়াইয়ে তাঁকে জিততে হবে!
দু দু'টো মুখের অন্ন জোগানোর সংগ্রামে
সীমাহীন এ পথ চলা।

স্বামী...
সেতো কেবলই সন্তানের জন্মদাতা মাত্র–
দায়িত্বহীন, বিবেকহীন, পাষণ্ড!
চলে যাবার একযুগ পরেও যখন
একটিবারের জন্যেও খবর নিল না
হিমেল পায়েল কেমন আছে–
এছাড়া তাকে আর কী বলা যায়?

তবু হিমেল পায়েলের শুভ্র হাসি
অনন্ত এই পথ চলার শক্তি জোগায় অনিমাকে।
তাইতো সুঁই আর সুতোর পরশে
নিপুণ হাতে বোনে আগামী দিনের স্বপ্ন।
ভালোই কাটত একটা সময়...
যখন পাশাপাশি সুইং লাইনে বা মেশিনে বসে
কাজের ফাঁকে একটুখানি লুকিয়ে দেখা...
অথবা কোনো এক ছুটির বিকেলে
বাদাম আর ঝালমুড়ি খেতে খেতে
সিনেমা দেখা।

এ শুধু এখন দুঃস্বপ্ন মাত্র।
মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় অনিমার–
ভাঙা ঘরের ছাদ গলে জ্যোৎস্নারা উঁকি দেয়,
মনের অজান্তে দু'চোখে ঝরে
নোনাজলের ঝর্নাধারা...।

অদৃশ্য অনুরাগ

মেহেদী হাসান
প্রাক্তন অফিসার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

এক

আলো নিভিয়ে সন্ধ্যে রাতেই রফিক নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল মুখ ঘুরিয়ে। আনোয়ারাও অন্য ঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিলো। হঠাৎ বাড়িটার যেন কেমন একটা বেহাল অবস্থা হয়ে গেল। কোনো ঘরে কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই। ঝগড়াটে আনোয়ারাকে শায়েস্তা করতে রফিক ঠিক করল রাতে আর খাবেই না। রফিক নিজের মনে গজগজ করছিল। বড্ড মুখ আনোয়ারার! রাতদিন বকবক করার মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে। বরাবর একই রকম। চোখে মুখে নরম ভাবটাই নেই। মেজাজি, বড্ড মেজাজি! মেয়েদের ওরকম রগচটা হলে চলে না। রাতদিন শুধু রফিকের ত্রুটি ধরে বেড়ানো। অনেক সহ্য করেছে রফিক। আর নয়, ও একজন ভদ্রলোক, এটাকেই আনোয়ারা হয়তো দুর্বলতা মনে করে।

রফিক আর আনোয়ারার শোবার ঘর পাশাপাশি। দু'ঘরের মধ্যিখানে অবশ্য একটা দরজা আছে। পাশের ঘরে আনোয়ারাও সব আলো নিভিয়ে কপালে হাত রেখে শুয়ে শুয়ে বদরাগী রফিকের বলা কথাগুলো নিয়েই ভাবছিল। ভীষণ জেদ লোকটার! একটা গোঁয়ার গোবিন্দ। নিজে যেটা বলবে সেটাই ঠিক। কারোর কথাই শুনতে চাইবে না। অ্যাডজাস্টমেন্ট শব্দটাই মানুষটার জীবনের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না...

রফিক ওর বিছানার পাশে রাখা টুলটার ওপরে ঠক করে কিছু একটা রাখার শব্দ শুনতে পেল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল আলো-আঁধারিতে অন্য কেউ নয়, যেন আনোয়ারাই ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। রফিক ব্যাপারটা বুঝে নিতে উঠে বসল। দেখল টেবিলের ওপর এককাপ চায়ের সঙ্গে সুগার ফ্রি একটা বিস্কুট। ও কনফার্ম হয়, অযথা শব্দ করে চায়ের কাপটা রেখে ঘর ছেড়ে যে এইমাত্র বেরিয়ে গেল, সে আর কেউ নয়, ঐ শাকচুন্নী

আনোয়ারাই! মুখে কোনো কথা না বলে কাপ-পিরিচে শব্দ তুলে রফিককে চা রেখে যাবার কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া। না না, এটাকে একটা ভালো ব্যবহার বলে মেনে নিতে পারে না রফিক। কাপে করে আনোয়ারা ওর জন্য কী নিয়ে এসেছে। চা, নাকি চিরতা ভেজানো জল। সে যাইহোক, রফিক আনোয়ারার রেখে যাওয়া চা কখনোই খাবে না। ও ভাবে, ওদের বিবাহিত জীবনের এতগুলো বছর হয়ে গেল, আজ অব্দি একটি দিনও আনোয়ারার দু'চোখের চাহনির মধ্যে ওই নরমসরম চাহনিটাই খুঁজে পেল না! মহিলা পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার মহারাণী! না না, রফিকের সিদ্ধান্তটার আজ আর একটুও নড়চড় হবে না। খাবে না বলেছেতো খাবেই না। সে আনোয়ারা যা ইচ্ছে বলুক, যা ইচ্ছে করুক...

চায়ের কাপটা রফিকের মাথার পাশে টেবিলের ওপর রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দরজার আড়ালে কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে আনোয়ারা বুঝে গেল, মানুষটা আজ রাতভর জ্বালাবে। চা-ফা কিছুই খাবে না। নিজের বিছানায় উঠে যেতে যেতে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে নিঃশব্দে ... শুধু আমি বলেই এরকম একটা হাড়বজ্জাত খিটখিটে মেজাজের মানুষের সঙ্গে এতগুলো বছর কাটিয়ে গেলাম। অন্য কেউ হলে কবেই...

রফিক অন্ধকার ঘরে শুয়ে খোলা জানালায় চোখ রেখে অর্থহীন চাহনিতে বিচ্ছিরি ঝগড়াটার পোস্টমর্টেম করে চলে নিঃশব্দে। সব বিশ্লেষণ একটা সিদ্ধান্তেই পরিণতি পায়, ও না হয়ে অন্য কোনো পুরুষ মানুষ হলে এতদিনে আনোয়ারা কবেই খরচা হয়ে যেত! যেতই! কী করে মানিয়ে চলতে হয়, সেটাই বোঝে না আনোয়ারা!

দুই

বাড়িময় গুমোট পরিবেশ। শ্মশানের নীরবতা। বাড়ির কারোর মুখেই কোনো কথা নেই। অসহ্য থমথমে পরিবেশ! আনোয়ারা শুয়ে শুয়ে নিজের সঙ্গেই লুকিয়ে লুকিয়ে ঝগড়া করে, খাবে না? বয়েই গেছে আমার! খেও না! ক'দিন খাবে না? ক'দিন না খেয়ে পারবে? আমারও জেদ, পায়ে ধরে খাওয়াতে যাব ভেবেছ? কক্ষণো না! ক্ষিদে পেলে নিজেই খাবে!

খোকার বৌ এসে অনেক করে বলেছে, বাবা খেয়ে নিন। রাতে পেট খালি রাখলে শরীর খারাপ করবে। কিন্তু রফিক মোটেও বার বার হেরে ভূত হবার মানুষ নয়। খাবে না! খাবার জন্য কত করে বলেও খাওয়াতে না পেরে দুধের বাটিটা টেবিলে ঢাকা দিয়ে চলে গেল বউমা। নিজের ঘরে গিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। শ্বশুর-শাশুড়ি যেখানে খাচ্ছে না, সেখানে ছেলের বউ ভাতের থালা নিয়ে বসতে পারে?

তিন

রাতটা অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। ওপাশের ঘরের দেয়াল ঘড়িটায় ঢং করে একটা শব্দ তুলে রাত একটা বাজার জানান দিলো। ওঘর থেকে খোকা আর বউমার মৃদু নাসিকাগর্জনের

শব্দটাও নিশুতিরাত ভেদ করে আনোয়ারার ঘরে ঢুকে পড়ে। চারিদিকে চাপ চাপ নিস্তব্ধতা। আনোয়ারা বুঝতে পারে, একটু একটু করে সন্ধ্যের ওলটপালট করে দেওয়া রাগটা মিলিয়ে যাচ্ছে হয়তো। ও বুঝতে পারে না রফিকও পাশের ঘরে খোকাদের মতো করে অঘোরেই ঘুমোচ্ছে কি না! আসলে আনোয়ারার বিশ্বাসই হয় না রফিকের ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারটা। রফিক ঘুমোবে পেটে ক্ষিদে নিয়ে, রফিকের মতো ক্ষিদে পাগল মানুষটা ঘুমিয়ে পড়বে, হতেই পারে না। আরে এই মানুষটাকেতো চল্লিশ বছর যাবৎ দেখছি। ক্ষিদে পেলেই মানুষটা যেন পাঁচ বছর বয়সী নাতি অয়নের মতো হয়ে যায়! মানুষটা কোনোদিনই ক্ষিদে সহ্য করতে পারল না। লোকটার প্রতিটি রক্তবিন্দুই তো আনোয়ারার চেনা, জানা। ক্ষুধার্ত রফিকের কষ্টটা পাশের লাগোয়া ঘরে শুয়ে থেকেও যেন আনোয়ারার মধ্যে উপলব্ধি হয়। আনোয়ারা যেন এখন ওই রফিকের সঙ্গেই নিঃশব্দে কথা বলছে। আরে বাবা তোমার ঝগড়াটাতো আনোয়ারার সঙ্গে। ক্ষিদের সঙ্গে তো নয়, তাহলে এভাবে ক্ষিদেয় কষ্ট পাবার মানে হয়!

চার

পাশের ঘরে রফিকের দু'চোখে ঘুম নেই। আপন মনে সন্ধ্যের ব্যাপারটার জন্যে নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করে চলে। চল্লিশ বছর যাবৎ-ই তো এই আনোয়ারাকে দেখেছে! ও এরকমটাই। বদলাবে না, কিছুতেই বদলাবে না। রফিকও নিজের ঘর থেকে পাশের ঘরের ঘড়িটাতে ঢং শব্দ তুলে রাত একটা বেজে ওঠাটা শুনতে পেল। এভাবেই বোবা একটা রাত আপন মনে বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি ঘরে শুয়ে থেকেও আনোয়ারার জন্য চিন্তা, দুর্ভাবনা ওর মধ্যে খামচাখামচি শুরু করে। রোজ রাতে খাবার পর একটা ওষুধ খেতে হয় আনোয়ারাকে। ওটা কোনো কারণে ডিসকন্টিনিউড হলেই সকালে আর বিছানা থেকে ওঠার শক্তিটাই থাকবে না ওর। ডাক্তার বার বার করে এসব কথা বলে দিয়েছে। রফিকের দুঃশ্চিন্তাটা এটা নিয়েই। ওর আশঙ্কা, বদ্ধমূল ধারণা– কাল সকালেই আনোয়ারা বিছানা নেবে। রফিক লোকটা ধরে নিলাম খারাপই। কিন্তু তুমিতো ভালো, তুমি তোমার শরীরটার কথা ভাববে না।

রফিক কিন্তু বাজি ধরতে পারে আনোয়ারা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে নেই। ওর দু'চোখে ঘুম নেই। জেগেই শুয়ে আছে। রফিককে আর কতরকমভাবে জব্দ করা যায় রাত জেগে তারই প্ল্যান প্রোগ্রাম কষে চলেছে ও! রাত পোহালেই সকাল হবে। রফিকের পিণ্ডি চটকানো শুরু হবে।

পাঁচ

বিকেল থেকেই আকাশে কালো মেঘ জমছিল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিটা নেমে পড়ল রাত প্রায় দু'টোর কাছাকাছি একটা সময়ে। সঙ্গে হিমেল হাওয়া আর বুকে কাঁপন তোলা মেঘের

গর্জন। শীত লাগছে আনোয়ারার। পরনের শাড়িটা দিয়ে শরীরটা ভালো করে ঢেকে নিল। ও ঘরের রফিকের কথাটা মনে হয়। ঐ ঘরে আজ চাদরটাও নেই। শরীরে জ্বলুনি তোলা চিটপিটে গরমেও যে মানুষটা একটা চাদর নিয়েই শোয়, সেই মানুষটা কী করে শুয়ে আছে। শীত লাগছে না! নির্ঘাত মানুষটা শীতে গুটিশুটি মেরে একটা কুণ্ডলি পাকিয়েই শুয়ে আছে। আসলে জেদ। ভাঙবে তবু মচকাবে না। মানুষটার তো পদে পদে বউকে জব্দ করার ফন্দি। তা না হলে মানুষটা আমায় ডেকে বলতে পারে না, আনোয়ারা, আমার চাদরটা কোথায়?

রাত শেষ হলে যে সকালটা শুরু হবে, নিদ্রাহীন রফিকের শুধু ওই বীভৎস সকালটার দুশ্চিন্তা। ডাক্তারতো পই পই করে বলেছেন, ওষুধটা একদিন বাদ পড়ে গেলেই আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। মানে একদিনও ডিসকন্টিনিউ করা চলবে না। এসব জানে আনোয়ারা। ও ওর শরীরের অবস্থাটা জানে। তবু খেলো না। আসলে নিজে বিছানায় পড়ে থেকে মজা দেখবে। রফিককে নাচাবে। এইরকমই শয়তানি ওর মাথার মধ্যে। রফিক নতুন করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এভাবে হয় না, চলে না। ও সত্যিকারের একজন পুরুষ হয়ে ওঠার সাহসী প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। মেয়েদের অত জেদ কেন থাকবে? অন্ধকার ঘরে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায় রফিক। প্রশাসনটাকে এত ঢিলেঢালা হতে দিলে চলে না। যে করেই হোক আনোয়ারাকে খাওয়াবে। খাওয়ানোর পর ওর ওষুধটাও ওকে জোর করে খাওয়াবে। বাতি না জ্বালিয়ে দু'ঘরের মধ্যিখানে দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে আনোয়ারার ঘরে ঢুকে ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলবে, যা হবার হয়ে গেছে আনোয়ারা। কালকের সন্ধ্যেটাতো তোমার আমার কাছে অতীত হয়ে গেছে! ওষুধটা তোমার বাদ পড়ে গেলে তো...

কিন্তু রফিকের মাথায় চিন্তাটা থমকে দাঁড়ায়, অন্য একটা পথে বাঁক নেয়। আনোয়ারার স্বভাবটাতো রফিকের অজানা নয়। ওকে অত রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে দেখেই দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ও নির্ঘাত চিৎকার চেঁচামেচি করে ওপাশের ঘরে ঘুমন্ত খোকা আর বউমার ঘুম ভাঙিয়ে এ ঘরে ডেকে আনতে আনতে খিঁচিয়ে উঠে বলবে, 'ন্যাকা!' রফিক হঠাৎ করে নেওয়া ওর সিদ্ধান্তটা ফিরিয়ে নিল। একদমই একটা কাঁচা কাজ হয়ে যাবে।

ছয়

পাশাপাশি দু'টো ঘরে দু'টো মানুষের মধ্যে সীমাহীন ছটফটানি। হয়তো তিনটে কখনই বেজে গেছে। দু'ঘরেই ঘোর দুশ্চিন্তা দু'ঘরের জন্য। রফিকের মধ্যে উপলব্ধি হয়, আনোয়ারা না থাকলে এত বড় বাড়িটাকে আর বসবাসের যোগ্য একটা বাড়িই মনে হবে না। ওই ভাবনাটা ওর বুকের ভিতরটায় ধুকপুকানি বাড়িয়ে তোলে। পাশের ঘরে আনোয়ারা এতটা সময়ে অন্য একটা আনোয়ারা হয়ে গেছে। ও রফিকের কাছে স্বীকার না করলেও এটা পরিস্কার বুঝতে পারে, রফিক আছে বলেইতো ওর ছেষট্টি বছর বয়সেও একটুও সংকট নেই। মানুষটা একদমই অন্য রকমের। নরমসরম মানুষটার ওপরটা শক্ত হলেও

ভেতরটা কাদা মাটিতেই গড়া। রফিকের পেটে আগুন জ্বলা ক্ষিদের খবরটা আর কেউ না জানুক, আনোয়ারার তো জানাই। এই লোকটার সঙ্গে ওর চল্লিশ বছর যাবৎ ঘর করা। চল্লিশ বছর যাবৎ যে মানুষটাকে নিয়ে ঘর করল সেই মানুষটার ক্ষিদেয় ছটফট করার কষ্টটা, মাঝরাতে হঠাৎ করে নেমে পড়া বৃষ্টি আর হিমেল বাতাসে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকার দৃশ্যটা না দেখেও উপলব্ধি করতে পারে আনোয়ারা। আনোয়ারা গজরায়, জেদ করে রাতভর না খেয়ে বিছানায় পড়ে থেকে ছটফট করা আসলে তো আর কিছুই নয়, ওই ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেবার মতোই একটা ব্যাপার। যে মানুষটা জীবনে কোনোদিনই ক্ষিদের সঙ্গে আপোশ করতে পারল না সেই মানুষটারই আবার অত মেজাজ কেন শুনি... নিস্তেজ হয়ে পড়া সন্ধ্যের জেদটা আনোয়ারার মধ্যে আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ওর মধ্যে হঠাৎই অনুভূত হয় ও রফিকের কাছে হেরে ভূত হয়ে যায়। রফিকের এসব একটা চালাকি। নতুন চাল। আনোয়ারাকে হারিয়ে দিতে না পারলেতো ওর কোনোদিনও শান্তি হয় না। আনোয়ারার মাথাটা একটু একটু করে তেঁতে ওঠে। না, রফিককে ওয়াকওভার দেওয়া যায় না কোনোমতেই। বিছানা থেকে নেমে অন্ধকার ঘরে পা টিপে টিপে রফিকের ঘরে গিয়ে ওর বিছানার পাশে দাঁড়াল আনোয়ারা। বউমা দুধের বাটিতে রুটি ছিঁড়ে দুধে ভিজিয়ে রফিকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল শ্বশুরকে খাওয়াবে বলে। টেবিলের ওপর ওই দুধ-রুটির বাটিটা এখনও তেমনই ঢাকা পড়ে আছে! রফিক খায়নি।

চোখ বুঁজে শুয়ে থেকেও রফিক আনোয়ারার উপস্থিতি বুঝতে পারে। এত রাতে ওর ঘরে আনোয়ারাকে ঢুকতে দেখে রফিক ঘাবড়ে যায়। রফিকের বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যায়, ঢিপঢিপ শব্দতরঙ্গ তোলে। চোখ তুলে তাকায় রফিক। দেখে, ওর বিছানার পাশের টেবিলে বউমার রেখে যাওয়া দুধের বাটিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়, তারই আতঙ্কের প্রতিমূর্তি বউটি!

রফিককে আনোয়ারার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকতে দেখে আনোয়ারার বুকের ভেতরটাতেও কেমন কাঁপুনি অনুভূত হয়। মানুষটা না আবার গলা চড়িয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলা শুরু করে, খোকা আর বউমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। আনোয়ারা নিজেকে শক্ত করে, ভিতরের নড়বড়ে অবস্থাটাকে সামলে নিয়ে চাপা গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে শাসানোর মতো করে বলে, একটা কথা নয়, কোনো সিন তৈরি করবে না, অনেক ঢং করেছ, এবারে চুপচাপ খেয়ে নাও। রফিক অস্ফুট স্বরে কিছু বলতে যেতেই আনোয়ারা কটমট করে তাকিয়ে দুধ-রুটির বাটিটা রফিকের দিকে এগিয়ে ধরে বলে, যেটা করতে বলছি করো। রফিক একঘর জমাট অন্ধকারের মধ্যেও আনোয়ারার মুখের দিকে তাকিয়ে শীতল হয়ে যেতে যেতে মিনমিনে গলায় বলে, খেতে পারি, কিন্তু আগে বলো, তুমিও খাবে!

এ এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য

আব্দুল কাদির হোসেন
সিনিয়র ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

সময়টা ছিল ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আমরা ব্যাবিলন গার্মেন্টসের কর্মকর্তা লেভেল পরিকল্পনা করলাম– এবার বাৎসরিক অবকাশ যাপনের ছুটি কাটাতে সুন্দরবন যাব। ব্যাবিলনের কালচার অনুযায়ী সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। এতদূরে, একেবারেই অচেনা জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে কয়েকজন একমত পোষণ করল, আবার কয়েকজন দ্বিমতও প্রকাশ করল। শেষ পর্যন্ত আমরা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সিদ্ধান্ত যেহেতু নেয়া হয়ে গিয়েছে এবার বাস্তবায়নের পালা। কীভাবে ভালোভাবে সুন্দরবন ঘুরে আসা যায় তা নিয়ে খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করলাম। একজনের নিকট হতে একটা ট্যুরিজম কোম্পানির নাম্বার নিয়ে যোগাযোগ করলাম। ওনারা জনপ্রতি তের হাজার টাকা প্যাকেজ অফার করল এবং এক লাখ টাকা অগ্রিম দিতে হবে জানাল। কথা বলে জানলাম ঢাকা বা খুলনা কোথাও তাদের কোনো অফিস নেই। ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না বিধায় ওনাদের সাথে আর কথা এগোলাম না। বায়িংয়ের একজন কিউসির মাধ্যমে সেলিম সাহেব নামে এক ভদ্রলোকের খোঁজ পেলাম যিনি সুন্দরবনে ট্যুর অপারেট করেন। তার সাথে যোগাযোগ করলাম। উনি আমাদের অফিসে আসার পর তার সাথে বিস্তারিত আলাপ করলাম। উনিও এক লাখ টাকা অগ্রিম চান কিন্তু ওনাদেরও কোনো অফিস নেই। দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলাম। এরপর সেই বায়িং কিউসি আশ্বস্ত করলেন, কোনো সমস্যা নেই, আপনারা টাকা দিতে পারেন। সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে তাকে এক লাখ টাকা দিলাম। আমাদের ভ্রমণের তারিখ নির্ধারিত হলো ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। কল্যাণপুর থেকে রাত ১০টায় বাস ছাড়বে। খুলনা পর্যন্ত বাসে গিয়ে এরপর মাইক্রোবাসে মংলা যাব।

যাত্রার দিনে সন্ধ্যা সাতটা থেকে সেলিম সাহেবকে ফোনে পাচ্ছি না। আমি ক্রমাগত রিং করেই যাচ্ছি, ওপাশ থেকে রিসিভ হচ্ছে না। অপরিচিত মানুষের হাতে অনেকগুলি টাকা দিয়ে দিয়েছি, টেনশনের পারদ বাড়ছিল। শেষমেষ উনি রাত সাড়ে নয়টায় কল ব্যাক করে জানালেন, ওনার ফোন সাইলেন্ট মোডে ছিল এবং উনি বাসস্ট্যান্ডেই আছেন। যাইহোক, যথাসময়ে সবাই বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালাম। আমাদের সাথে ছিল একটা বিশাল আকৃতির কার্টন। কার্টন ভর্তি চিপস্, চকলেট, বাদাম, বিস্কুট, চানাচুর এসব দেখে উনিসহ আশেপাশের অনেকেই খুবই অবাক হয়ে গেল। ঘটনাটা ছিল আসলে এরকম, আমাদের সবাই জেনে গিয়েছিল যে সুন্দরবনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার পর হতে আবার মংলায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত কোনো দোকান পাওয়া যাবে না। তাই ঐ সময়ের জন্য ফিনিশিং ম্যানেজার মাহবুব সাহেব এক বিশাল কার্টন ভরে এসব খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে।

অবশেষে রাত ১০টায় আমাদের গাড়ি ঢাকা থেকে খুলনার উদ্দেশে রওনা হলো। গাড়ি ছাড়ার কিছুক্ষণ পর সেলিম সাহেব আমাদের প্রত্যেকের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেন। প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও উনি আমাদের এ সার্ভিসটি দিয়েছিলেন। পরদিন ভোরে খুলনা পৌঁছে নাশতা করে মাইক্রোযোগে মংলার উদ্দেশে যাত্রা করলাম। চলতি পথে খুলনার সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। তখনই একজন প্রস্তাব করল, আমরা মংলা যাবার পথে খুলনা খান জাহান আলীর মাজার এবং ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখে যাব। এটি আমাদের প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সেলিম সাহেব জানালেন এখন সময় স্বল্পতার কারণে সম্ভব হবে না তবে ফেরার পথে উনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন। মংলা থেকে ফেরার পথে উনি আমাদের খান জাহান আলীর মাজার এবং ষাট গম্বুজ মসজিদ ঘুরিয়ে এনেছিলেন।

সকাল ১১টা নাগাদ আমরা মংলা পৌঁছলাম। মংলা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর। এটি পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। একটি নৌকায় করে আমাদের জাহাজে উঠিয়ে দেয়া হলো। জাহাজে ওঠার পর সবাই যার যার কেবিনে চলে যাই। ফ্রেশ হবার পর সেলিম সাহেবের ডাকে ডেকে এসে দেখি অপরিচিত ২জন ভদ্রলোক বসে আছেন। সেলিম সাহেব জানালেন– ওনারা জাহাজের মালিক, ট্যুরের অবশিষ্ট টাকা নিতে এসেছেন। যদিও আমাদের সাথে কথা হয়েছিল, অবশিষ্ট টাকা সুন্দরবন ভ্রমণ শেষ হবার পর দেয়া হবে। যাইহোক, সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে ওনাদের বাকি টাকা দিয়ে দেয়া হলো। টাকা নিয়ে ওনারা নেমে গেলেন। জাহাজ যাত্রা শুরু করল সুন্দরবনের দিকে।

এখানে উইকিপিডিয়া হতে সংগৃহীত কিছু তথ্য দিয়ে রাখি। সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা,

বাগেরহাট, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড ম্যানগ্রোভ বনভূমি। ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে বাকিটা ভারতের মধ্যে পড়েছে। ১৯৯৭ সালে সুন্দরবন ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বনভূমিটি বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানান ধরনের পাখি, চিত্রা হরিণ, কুমির ও সাপসহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। এই বনে বাঘ ছাড়াও রয়েছে চিতা বাঘ, হরিণ, গন্ডার, মহিষ, কুমির, অজগর। এই বন ১২০ প্রজাতির মাছ, ২৭০ প্রজাতির পাখি, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৮টি উভচর প্রজাতির আবাসস্থল। ২০১৫ সালের হিসাব মতে সুন্দরবনে মাত্র ১০৬টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে।

যাইহোক, নদীর মাঝ দিয়ে আমাদের জাহাজ যাত্রা শুরু করল। জাহাজের দু'পাশ দিয়ে আরও অনেক ছোট ছোট নৌকা সারিবদ্ধভাবে এগুচ্ছে। ওগুলো সম্ভবত জেলে নৌকা ছিল। জাহাজ থেকে দেখতে খুব ভালো লাগছিল। ৩টার মধ্যে আমরা গোসল ও মধ্যাহ্নভোজন সেরে ফেলি। ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে আসলো। এপ্রিলের আকাশে একটু একটু মেঘ জমতে থাকে। মেঘ থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। অজানা অচেনা অন্ধকার বনের মাঝ দিয়ে জাহাজ চলছিল। আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই। নদীর দুই তীরে না আছে কোনো গ্রাম, না দেখা যায় কোনো আলোর চিহ্ন। জাহাজ ধীরে ধীরে বনের আরো গভীরে প্রবেশ করতে লাগল। রাত নেমে এল বনে। চারপাশ পুরোটাই জমাট অন্ধকার। চাঁদ মেঘে ঢাকা থাকায় তেমন কোনো আলো ছড়াচ্ছিল না। আলো ছিল না আমার কয়েকজন সহকর্মীর মনেও। কারো কারো মনে রীতিমতো আতংক বাসা বাঁধছিল। খোলা ডেকে কেউ কার্ড খেলছে, কেউ মোবাইল নিয়ে আছে, কেউ লুডু খেলছে, কয়েকজন গোল হয়ে গল্প করছে, কিন্তু তারপরেও অনেকের ভিতরেই অস্বস্তি বোঝা যাচ্ছে। এরই মধ্যে রাতের খাবারের আয়োজন চলছে। রাতের খাবার শেষে এক জায়গা থেকে বন বিভাগের সশস্ত্র নিরাপত্তা কর্মী জাহাজে উঠল। জাহাজ আবার চলতে শুরু করেছে। ততক্ষণে আমাদের কারোর মোবাইল ফোনেই আর নেটওয়ার্ক নেই। সবাই বিভিন্নভাবে আনন্দ বিনোদন করার চেষ্টা করলেও মনের ভীতিটা কাটছিল না। একটু পর মিরাজ সাহেব, রজব সাহেবসহ আরো কয়েকজন মন খারাপ করে যার যার কেবিনে চলে গেল। ভয় আতংকে রূপ নিয়েছে বুঝতে পারলাম যখন শুনলাম আহাদ সাহেব নিচে গিয়ে কয়েকজনকে বকাঝকা করা শুরু করল এই বলে, "নাচ-গান বন্ধ করো, আল্লাহ খোদার নাম লও।" এরপর আহাদ সাহেব তসবিহ হাতে নিয়ে নিজেই আল্লাহ খোদার নাম জিকির করতে শুরু করলেন। রাত ১২টার দিকে সেলিম সাহেব আমাদের জানালেন, জাহাজ এখন নোঙ্গর করবে। সকালে খুব ভোরে উঠতে হবে বিধায় আমরা সবাই যার যার কেবিনে চলে যাই। ততক্ষণে মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনেকে ঘুমিয়ে গেলেও আমার ঘুম আসছিল না। অজানা জংগলে এতগুলি মানুষকে নিয়ে এসেছি, ফোনে নেটওয়ার্ক নেই, জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার,

জলদস্যুর ভয়! এসব মিলে আমি অনেকটাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। মানসিক চাপ অনুভব করছিলাম। ঘুম আসছিল না একদমই। কেবিন থেকে বের হয়ে জাহাজের সামনে গিয়ে বসলাম। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এক অপার্থিব সৌন্দর্য। রাত তখন প্রায় দুইটা। গভীর অরণ্যের মাঝে জাহাজটা পানিতে হাল্কা দুলছিল, বেশ ঠান্ডা একটা পরিবেশ, বনের ঝি ঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছিল। মাত্র তিনদিন আগে ছিল পূর্ণিমা। গভীর বনের মাঝখানে জ্যোৎস্নালোকিত রাতে মেঘমুক্ত আকাশের চাঁদ নদীর জলে পড়ে যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, প্রকৃতির সে রূপের বর্ণনা দেয়ার মতো ভাষাজ্ঞান আমার নেই। আমি শুধু আমার অনুভূতি দিয়ে অনুভব করছিলাম সে দৃশ্য। আমার মনের চাপ অনেকটাই কমে গেল সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে। সেদিন রাত প্রায় আড়াইটার দিকে ঘুমাতে গেলাম।

ঘন্টা দুই ঘুমানোর পরই কানে ভেসে আসলো বন ময়ূরের ডাক, ঘুম ভেঙে গেল। ততক্ষণে ভোরের আলো হাল্কা ফুটতে শুরু করেছে। সকালের বন দেখতে অপরূপ সুন্দর। সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো। নোঙ্গর উঠিয়ে জাহাজ আবার চলতে শুরু করল। জাহাজ একটি ছোট নদীর মাঝ দিয়ে চলছিল। দুই পাশেই নানা জাতের গাছপালার নিবিড় বন দেখা যাচ্ছে। সেলিম সাহেব আমাদের সুন্দরী, গরান, গোলপাতা প্রভৃতি চেনাতে লাগলেন। দেখলাম সুন্দরী গাছ খুব সুন্দরি না আর গোলপাতাও গোল না, লম্বাটে গড়নের। জাহাজ এবার থামল। আমরা জাহাজের সাথেই থাকা নৌকায় উঠলাম। নৌকা একটি খালের মধ্যে প্রবেশ করল। কিছুটা চলার পর শুকনো একটি জায়গায় আমরা নৌকা থেকে নামলাম। সেখানেই খুব নিকট থেকে সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল দেখলাম। পুরো বনের মাটি সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল দিয়ে ভর্তি। খালি পায়ে হাঁটলে পা কেটে যেতে পারে। দিনের ঝলমলে আলো আর ঠান্ডা হিমেল হাওয়া গায়ে মেখে বনের মাঝ দিয়ে হাঁটতে ভালো লাগছিল। বন বিভাগের সশস্ত্র প্রহরী আমাদের বার বার সাবধান করছিল– এক লাইনে হাঁটতে হবে, কোনো হৈ চৈ করা যাবে না ইত্যাদি। হাঁটতে হাঁটতে সবাই বাঘের খোঁজে এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারছিলাম। গতরাতের হতাশা আর আতংক ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম। ভয়টা কমে যাচ্ছে, একটু একটু আনন্দের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকজন আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে কয়েকটা লাঠি ভেঙে নিল বাঘের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। আমরা হেঁটে হেঁটে বন পার হচ্ছিলাম, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম মামার দেখা পাই কিনা সে আশায়। কিন্তু নেই.... কোথাও তো নেই... মামার দেখা পেলাম না। কয়েকটা হরিণের দেখা পেলাম। প্রায় ঘন্টা তিনেক বনে হেঁটে বেড়ালাম। এরপর মামার দেখা না পেয়ে আমরা নৌকায় করে আবার জাহাজে ফিরে গেলাম। নোঙ্গর তুলে জাহাজ আবার চলতে শুরু করল। গতরাতের মেঘ ততক্ষণে পুরো কেটে গিয়েছে– আকাশ এবং আমার সহকর্মীদের মন থেকে। সবার চোখে-মুখে আনন্দ আর বাঘ দেখার আগ্রহ, উত্তেজনার ছোঁয়া লক্ষ্য করছি। জাহাজে সেলিম সাহেব আমাদের জন্য নাশতার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এ ব্যাপারটি আলাদা করে বলতেই হয়। সুন্দরবন ট্যুর মানেই রসনা বিলাসের ব্যাপক আয়োজন। তিন বেলা প্রধান খাবার ছাড়াও কয়েকবার বিভিন্ন ধরনের

নাশতা, শরবত পরিবেশন করা হচ্ছিল। আর খাবারগুলোও স্বাদ, মান ও বৈচিত্রে বেশ উন্নত।

নাশতা করতে করতেই জাহাজ কটকা পৌঁছায়। কটকা সুন্দরবনের দক্ষিণতম প্রান্ত, বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। কটকাতে বন বিভাগের একটি রেস্ট হাউস আছে। জাহাজ থেকে রেস্ট হাউজে ওঠার জন্য একটি কাঠের জেটি আছে। এ জেটি বেয়ে কিছু দূর হাঁটলেই রেস্ট হাউজ। এর সামনেই দেখা যায় সাগরের অথৈ জলরাশির বিশাল বিশাল ঢেউ। এর আশেপাশে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় খাল। এসব খালে নৌকা নিয়ে ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক। খালের ধারে দলে দলে চিত্রল হরিণ চরে বেড়াতে দেখা যায়। এছাড়া বানর, উদবিড়াল ও বন মোরগ দেখা যায়। মাঝে মাঝে বাঘের গর্জনও শোনা যায়। জাহাজ থেকে নেমে বনের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা পায়ে হেঁটে এরপর বিচে পৌঁছতে হয়। আমাদের পৌঁছতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন অনেককেই দেখলাম ফিরে আসছে। তাদের মুখে মুখে শুনলাম তারা নাকি বাঘ দেখতে পেয়েছে। বাঘ একজনের উপর আক্রমণ করেছে। এসব শুনতে শুনতে আমরা হেঁটে হেঁটে বন পার হচ্ছিলাম। আশপাশে কিছু ঝোপঝাড় ছিল যেগুলোর নাম 'টাইগার ফান'। বাঘ এসব ঝোপের ভিতর শিকারের জন্য ওত পেতে বসে থাকে। এসব দেখতে দেখতে বনের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমরা সমুদ্র সৈকতে পৌঁছাই। সবাই খুব আনন্দ করে সমুদ্র স্নান করলাম। আনন্দ লাগছিল আবার কুমিরের ভয়ও কাজ করছিল। গোসল শেষে একই রাস্তা দিয়ে জাহাজে ফিরে আসলাম। এরপর দুপুরের খাবার খেয়ে ডেকে বসে বসে সুন্দরবনের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। কটকা থেকে জাহাজ আমাদের পাশেই বনের আরেকটি অংশে নিয়ে যায়। শুনলাম সেখানে অনেক হরিণ আছে। জাহাজ থেকে নেমে হরিণ দেখার জন্য বনের মাঝ দিয়ে চলা শুরু করলাম। অনেকেই দেখলাম এখানে আমাদের মতোই হরিণ দেখার জন্য এসেছে। হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম চিত্রা হরিণের বেশ বড় এক পাল (আনুমানিক কয়েকশত) ছুটতে ছুটতে ঠিক একেবারে আমাদের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ওরা আগে আমাদের খেয়াল করেনি। আমাদের দেখেই পুরো পাল একদম থমকে দাঁড়াল। সেই দৃশ্যটি আজও আমাদের মনে অবিকল গেঁথে আছে। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, বর্ণনাতীত। মনে হলো বিশাল পালটি আমাদের দেখে যেন হার্ড ব্রেক করে গেল। আমাদের মতো ওরাও হতভম্ব হয়ে গেছে বোধ হয়। কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ আমাদের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থেকে এরপর ঘুরে আবার দৌড়ে পালাল। আনুমানিক কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই নিঃশব্দে আবার বনের মাঝে হারিয়ে গেল। বনের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে কানে ভেসে আসলো সমুদ্রের গর্জন। বুঝতে পারলাম সাগর নিকটেই। এখানেই দেখতে পাই সিডরের তাণ্ডবলীলা। ভাঙা, দুমড়ানো, ডালপালা পাতাবিহীন গাছের কাণ্ডগুলি দেখে বুঝতে পারি সুন্দরবন সিডরের আঘাত নিজের বুকে নিয়ে কীভাবে আমাদের সাথে রাগ করেছে। রাতে সেলিম সাহেবের নিকট শুনলাম, আগামীকাল সকালে আমরা করমজল পৌঁছব।

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের অধীন করমজল পর্যটন কেন্দ্রটি ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থান। ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র ছাড়াও এখানে রয়েছে বাংলাদেশের 'হরিণ ও কুমিরের প্রজনন ও লালন পালন কেন্দ্র।' পুরো এলাকাটিই পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয়। এখানে প্রবেশপথেই মাটিতে শোয়ানো বিশালাকৃতির মানচিত্র সুন্দরবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে। মানচিত্রটিকে পেছনে ফেলে বনের মধ্যে দক্ষিণে চলে গেছে আঁকাবাঁকা কাঠের তৈরি হাঁটা পথ। বনের বুক চিরে কাঠের তৈরি বেশ দীর্ঘ একটি পায়ে চলার পথ। দেখতে অসম্ভব সুন্দর এই স্থানটি। এর নাম 'মাঙ্কি ট্রেইল।' এই নামের স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় ট্রেইলে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই। পুরো ট্রেইল জুড়েই দেখা মিলবে সুন্দরবনের অন্যতম বাসিন্দা রেসাস বানরের। বানরগুলো টুরিস্টদের কাছাকাছি চলে আসে। হাতে কলা বা অন্য কোনো খাবার নিয়ে পথ না চলাই ভালো। কারণ বানরগুলো খাবারের জন্য আপনাকে ঘিরে ধরতে পারে। তাই বানর থেকে সাবধান থাকতে হয়। করমজলে আমরা দুপুর পর্যন্ত ছিলাম। ওখানে মিঠা পানি দিয়ে গোসল করলাম। সারাদিন হরিণ বানরসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও পাখি দেখে বিকেলে জাহাজে ফিরে গেলাম। রাতে আমাদের জন্য বার-বি-কিউ পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। বার-বি-কিউ অনেক মজাদার হয়েছিল। ফিরতি পথে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা অনেক আনন্দ ফূর্তি করলাম।

মংলা পৌঁছতে পৌঁছতে পরদিন বেলা ১১টা বেজে যায়। আমাদের ফেরার গাড়ি ছিল দুপুর দু'টায়, তাই মংলা বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করার পর কিছুক্ষণ জাহাজেই ভেসেছিলাম। ঐ দুই ঘন্টায় জাহাজের ডেকে নানান ধরনের গান, কৌতুকে সময় পার করি। এ সময়েই কয়েকজন বলল আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণের মোট সময়টা কম হয়ে গেছে, আর কয়েকটা দিন বেশি থাকতে পারলে আরো ভালো লাগত। ঠিক তখনই আমি উপলব্ধি করলাম, আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণ আসলেই সার্থক হয়েছে। প্রথম রাতের থমথমে আতঙ্কের বদলে সবার চোখে-মুখে ছিল আনন্দের ছাপ। সুন্দরবন ভ্রমণ আসলেই অন্যরকম সুন্দর, আমার ভাষায়– এ এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য।

ফেইসবুক

এম এম তোফাজ্জল হোসেন
সিনিয়র ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

ফেইসবুক কী? ফেইসবুক (Facebook) সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট। ফেইসবুক নিয়ে কিছু বলার আগে আসুন এর শুরুর দিকের গল্পটা শুনে নেই। ২০০৪ সালে মার্ক জুকারবার্গ নামক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ফেইসবুক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় ফেইসবুকের পূর্বসূরি ওয়েবসাইট ফেসম্যাশ তৈরি করেন। এজন্য মার্ক জুকারবার্গ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেটাবেইজ হ্যাক করেন। এতে তিনি হার্ভার্ডের ৯টি হাউসের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সুদর্শন তরুণ-তরুণীদের ছবি ব্যবহার করেন। তিনি দুইটি করে ছবি পাশাপাশি দেখান এবং হার্ভার্ডের সব শিক্ষার্থীদের ভোট দিতে বলেন। কোন ছবিটি হট আর কোনটি হট নয়। 'হট অর নট।' এভাবে ছবি দেখে আবেদনময়ী তরুণ-তরুণী বাছাইয়ের হিড়িক পড়ে যায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতে কলেজের ওয়েব সার্ভারে বাড়তি চাপ পড়ায় কর্তৃপক্ষ ওয়েবপেজটি বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এরপরই শিক্ষার্থীরা দাবী তোলে যে, ও রকম একটি ওয়েবসাইট তাদের চাই– যেখানে শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা, ছবি ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য থাকবে। এ কথা শুনে মার্ক ঘোষণা করেন যে, কর্তৃপক্ষ না দিলে তিনি নিজেই শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি ওয়েবসাইট তৈরি করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়েই জুকারবার্গের হাতে জন্ম নেয় পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৃহত্তম সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেইসবুক। ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হার্ভার্ডের ডরমিটরিতে ফেইসবুকের উদ্বোধন করেন মার্ক জুকারবার্গ। সারা বিশ্বে বর্তমানে এই ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করছেন প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষ।

ফেইসবুকে কী করা যায়? ফেইসবুকে যা যা করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বিনামূল্যে একাউন্ট খোলা, বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ, নতুন বন্ধু তৈরি, ফটো/ ভিডিও আপলোড, টেক্সট/ ভিডিও চ্যাট, লাইভ ভিডিও সম্প্রচার, বিজ্ঞাপন দেয়া, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা ইত্যাদি। বর্তমানে কোটি কোটি মানুষের জীবন যাপনের অপরিহার্য অনুসঙ্গে পরিণত

হয়েছে ফেইসবুক। মানুষ ফেইসবুকের মাধ্যমে সংবাদপত্র বা প্রচলিত অন্যান্য গণমাধ্যমের পূর্বেই দেশ বিদেশের নানাবিধ খবর জেনে যাচ্ছে। ফেইসবুকের মাধ্যমে তথ্যের প্রবাহ খুব দ্রুত হচ্ছে এটা অনস্বীকার্য। ফেইসবুকের দ্বারা মানুষ ২০/৩০ বছর পর তার বাল্যবন্ধু খুঁজে পাচ্ছে। মানুষ এখন সব সময়ে জানতে পারছে তার প্রিয়জন কী করছে বা কোথায় যাচ্ছে। বছরের পর বছর দেখা না হলেও নিয়মিত ফটো দেখতে দেখতে মনেই হয় না যে বন্ধুর সাথে কয়েক বছর দেখাই হয়নি। গত কয়েক বছরে বেশকিছু সামাজিক আন্দোলন ও বিপ্লবে মানুষ দ্রুত সংগঠিত হয়েছে ফেইসবুকেরই মাধ্যমে। আরব বসন্তের বিপ্লবের সূত্রপাতও ফেইসবুকেই হয়েছিল। মৌলভীবাজারের শিশু রাজনকে পিটিয়ে যেভাবে খুন করা হয়েছে, তা ফেইসবুকের বদৌলতেই ছড়িয়ে গেছে সকলের মাঝে; দূর প্রবাসে পালিয়ে যাওয়া কামরুলকে ধরে আনা সম্ভব হয়েছে দেশের মাটিতে। তনু হত্যার খবর হয়তো সম্পূর্ণ ধামাচাপা পড়ে যেত যদি মানুষ ফেইসবুকে প্রতিবাদের ঝড় না তুলত।

ফেইসবুক সহজলভ্য হওয়ায় বাংলাদেশে ই-কমার্স দিন দিন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং সহজ করেছে ফেইসবুক। একজন গৃহবধূ বাসায় রান্না করে বা বুটিকের কাজ করে ঘরে বসেই ফেইসবুকে তার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে তা বাজারজাত করতে পারছে। পঞ্চগড়ের কোয়েল পাখিপালক তার ডিমের নতুন বাজার খুঁজে পাচ্ছে চট্টগ্রামের চাইনিজ রেস্টুরেন্টে, তাও এই ফেইসবুকেরই কল্যাণে। দিন দিন ফেইসবুক অধিকতর শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যম হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক– সকল ইস্যুতেই ফেইসবুকে মানুষ তার নিজ নিজ মত প্রকাশ করছে। সেসব মতামত বিভিন্ন সময়ে বেশ কার্যকরী ভূমিকাও রাখছে। ফেইসবুকে প্রতিবাদ জানিয়ে মিলছে স্বাধীনতা পুরস্কারের মতো জাতীয় পুরস্কারও। ফেইসবুকে ব্যাপক প্রচারের ফলেই প্রধানমন্ত্রীসহ সাধারণ মানুষ নানা দুর্যোগে বিপন্ন, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বাড়তি তাগিদ পায়।

ফেইসবুকের এসব ইতিবাচক ব্যবহারের পাশাপাশি রয়েছে এর নানারকম নেতিবাচক প্রভাব। মানুষ অনলাইনে অবস্থান তৈরি করতে এবং আবেগপূর্ণ বেদনা দূর করতে ফেইসবুকের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। কিছু মানুষ ফেইসবুক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে একসময় আসক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ফেইসবুকের বাড়াবাড়ি রকমের এই আসক্তির ফলে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফেইসবুক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তাদের মানসিক রোগী ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যখন কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি ফেইসবুকের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, তখন তার কাজের গতি কমে আসে। সঠিকভাবে তিনি দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

ফেইসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা অকল্যাণও ডেকে আনছে। ফেইসবুকের দ্বারা বিভিন্ন অসাধু মানুষ

বিভিন্ন অসত্য তথ্য প্রচার করে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও অনেক সময় লঙ্ঘিত হয় ফেইসবুকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে। বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে নানারকম কুৎসা অপপ্রচার করা হয় ফেইসবুকের মাধ্যমে। নানা সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুযোগসন্ধানীরা নানা রকমের মিথ্যা তথ্য ফেইসবুকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে মানুষকে ক্রুদ্ধ করে দিয়ে নানারকম দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। ধর্মান্ধ উগ্রবাদী শক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে তাদের অপকর্মের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিচ্ছে। যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সনাতন ধর্মাবলম্বনকারীদের উপর হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই রংপুরে তাদের বাড়ি-ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গো-হত্যার দায়ে মুসলমানদের হত্যা করার পিছনে ফেইসবুকের অপপ্রচারই দায়ী।

ফেইসবুক আসলে কী? এটা কি এক ধরনের নেশা, নাকি বিনোদন?
আমার মতে, ফেইসবুক এক প্রকার ছুরির মতো। ছুরি দিয়ে একজন ডাক্তার যেমন অপারেশন করে রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে, তেমনি অসাধু ব্যক্তি সেই ছুরি দিয়েই মানুষের প্রাণ নিয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ ফেইসবুকের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যে ব্যবহার করছে সেই ব্যক্তির মানসিকতার ওপর।

তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া

বিভীষিকাময় একটি রাতের কাহিনী

প্রদীপ কুমার দত্ত
প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

১৯৭১ সাল। সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। বাঙালি জাতি অধিকৃত পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপন লড়ছে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। সিভিল প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় থানার পুলিশ প্রশাসন চালাচ্ছে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত স্বল্পশিক্ষিত রাজাকারেরা। গঠন করা হয়েছে শান্তি কমিটির নামে স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে একেক এলাকায় একেক সংগঠন। স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে এদের অবস্থান সুস্পষ্ট। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, যুবতি মহিলাদের ধরে এনে পাকবাহিনীকে যোগান দেওয়া, গরু, খাসী, মুরগি ধরে এনে জবাই করে খাওয়ানো এদের কাজ।

মাঝে মাঝে মুক্তিবাহিনীর মুক্তিকামী সদস্যরা রাতে আচমকা এসে কয়েকটা গুলি, গ্রেনেড ছুঁড়ে আবার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যায়। এর নাম গেরিলা যুদ্ধ। কালান্তরে এ যুদ্ধই সারাদেশে ব্যাপ্তি লাভ করে এবং পরিণতিতে দেশ স্বাধীন হয়।

আমাদের বাড়িতেও ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প গড়ে ওঠে। তাঁদের কাছে দেখেছি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এলএমজি, এসএমজি ও গ্রেনেড। এ ধরনের হালকা, মাঝারি আগ্নেয়াস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ। দশ বারোজন একসাথে আসত, কয়েকদিন থাকত। মাঝে মাঝে দলে, উপদলে ভাগ হয়ে রাতে অপারেশনে বের হতো। কয়েকদিন পর ওরা চলে গেলে অন্য আর এক দল আসত। আমাদের বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর আনোগোনার খবর ইতোমধ্যে তিন মাইল দূরে অবস্থিত থানা হেড কোয়ার্টারে পাক বাহিনীর নিকট পৌঁছে গেছে। আমরা খুব ভয়ে আছি। তখন আমি উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী ছিলাম। বয়স সতের বছর। আমরা জানতে পারি, যে কোনো সময় পাকবাহিনী অতর্কিতে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে আসবে।

কিছুদিন আগে শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে মিটিং করে বলে গেছেন– আমি আপনাদের রক্ষা করতে চাই। কিন্তু শর্ত হলো কোনো মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেবেন না এবং মিলিটারি আসলে যতটা সম্ভব নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে যাবেন। ওদের সামনে পড়বেন না। ওদের সামনে পড়ে গেলে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। তখন আমি আপনাদের রক্ষা করতে পারব না।

এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনী এক গোপন অপারেশনে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর সাবকে ধরে নিয়ে যায়। এর জের ধরে রাজাকার এবং পাক-মিলিটারির দল এসে পাশের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে এবং নির্বিচারে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেছে।

অবস্থার দিন দিন আরও অবনতি হতে থাকে। এখন আমরা আর বাড়িতে থাকা এমনকি দেশের অভ্যন্তরে থাকা মোটেই নিরাপদ মনে করছি না। তাই আমরা পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং প্রতিবেশী অন্যান্য বাড়ির মোট একুশজনকে নিয়ে এক রাতে অজানা পথের উদ্দেশে রওনা দেই। ভাদ্র মাস। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। রাতের খাবার খেয়ে যে যা পারি কাপড়-চোপড়, বাক্স, চিড়া, মুড়ি, চাল, গুড় নিয়ে শিশু ও মহিলাসহ বেরিয়ে পড়ি। আমরা ছয়জন পুরুষ, বাকি সব মহিলা ও শিশু। রাতের আকাশ। সব নিস্তব্ধ। আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠেছে। কিন্তু মেঘ এসে বার বার চাঁদের আলো ঢেকে দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ আধো আলো অন্ধকারে একজন আরেকজনকে আবছা আবছা দেখা যায়। মনে এক অজানা ভয়। বিস্তীর্ণ মেঠোপথের আল ধরে হাঁটছি। শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কান্না করে ওঠে। অবুঝ শিশুদের কান্না থামানোর অদম্য চেষ্টা চলে, যাতে আমাদের এ যাত্রা কেউ টের না পায়।

রাস্তার পাশে উঁচু গাছ। আমাদের চলার পথে একসাথে অনেকের পায়ের শব্দে গাছের পাখিগুলো বাসা ছেড়ে উড়ে এদিক ওদিক বিচরণ করে কিচিরমিচির ডেকে ওঠে। কোনো কোনো পাখি উচ্চ রবে ডেকে ওঠে এবং পাখা ঝাপটায়। আমরা আরও সন্তর্পণে হাঁটতে থাকি যাতে কোনো কাক পক্ষিটিও টের না পায়, কিন্তু হঠাৎ পাখির নড়াচড়া দেখে আমরা আরও সতর্ক হয়ে উঠি। ছোট ছোট ব্যাঙ হঠাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড় দেয়। আমাদের দলপতি ছিলেন আমাদের পাশের বাড়ির সকলের প্রয়োজনের এক কাকু। আমরা দলের সবাই তাঁর অনুগামী হয়ে হাঁটছি। মাইলের পর মাইল শিশু ও মহিলাসহ কত পথ হাঁটতে হবে আমরা জানি না। এরপর আমাদের যানবাহন কী হবে, নৌকা না গরুর গাড়ি? রাত পোহালে কোথায় আশ্রয় পাব? মনে শঙ্কা, ভয়, উদ্বেগ, হাজারো চিন্তা মগজে ভর করছে। দেশের এ কী অবস্থা! কেন এভাবে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি? বাবা-মাকে বাড়িতে রেখে এসেছি। তাদের কি আর ফিরে এসে জীবন্ত দেখতে পাব? গত এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে যে জায়গির বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছিলাম সেই মোক্তার বাড়িটির সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে। আমার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য বইপত্র, বিছানা, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র সব নিয়ে

গেছে। ঐ বাড়ির সবাই একটু দূরে অন্য গ্রামে আত্মগোপনে ছিল। পাক মিলিটারিরা এক রাতে এসে মোক্তার বাবু, তার দুই ছেলে এবং মেয়ের জামাইকে ধরে নিয়ে গেছে। তাঁরা আর ফিরে আসেননি। সে মাসের এক সকালে আমাদের পাশের গ্রামের প্রাচীন জমিদার বাড়ির বাবুকে ধরে নিয়ে সারাদিনভর নির্যাতন করে দিনশেষে গুলি করে মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। প্রতিবেশিরা তার লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। তিনি তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য মিলিটারি আসার আগাম খবর পেয়ে জঙ্গলে পালিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে পাক মিলিটারিরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে ধরতে পেরেছিল। তিনদিন যাবৎ তাঁর বাড়ি লুটপাট হয়। এমনকি পুরনো দালানের ইটগুলো খুলে নিয়ে যায়। গত জুনের এক রাতের আঁধারে স্থানীয় থানার বাজারে মিলিটারি সন্দেহভাজন লোকদের ধরে ধরে শিশু ও মহিলাসহ অসংখ্য লোককে হত্যা করে এবং দোকানপাট, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

বাঁচার তাগিদে যে যেভাবে পারছে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে পাশের দেশ ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে। যুবকরা ভারতে মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার দেশে ফেরত এসে জীবন বাজি রেখে প্রাণপন যুদ্ধ করছে। জয় হবেই। শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। এতসব ভাবতে ভাবতে আমরা সংকীর্ণ আলপথ ছেড়ে অদূরে প্রশস্ত সড়কপথে উঠে বাম দিকে মোড় নেব। এমন সময় আমাদের পিছন দিক থেকে আসা কিছু লোকের অস্পষ্ট গুঞ্জন এবং ধেয়ে আসার শব্দ টের পাই। আমরা আরও দ্রুত হাঁটছি। মনে হলো যারা ছুটে আসছে তারা আমাদের অনুসরণ করছে এবং আমাদের পিছু পিছু দ্রুত ধাওয়া করছে। বিপদ টের পেয়ে কিছু বুঝে উঠতে না পেরে আমরা আরও দ্রুত থেকে দ্রুততর প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছি। কিন্তু আমাদের সাথে শিশু এবং মহিলারা সাথে সাথে দৌড়াতে পারছে না। আমরা এখন যে রাস্তায় উঠে এসেছি সেখানকার এলাকাটা জনবিরল এবং কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর নেই। তবে রাস্তার দুধারে উঁচু উঁচু কচুগাছ, ফুলগাছ ও অন্যান্য ঝোপঝাড়ে ভরা। আমি উদ্যোগী হয়ে দ্রুত আমাদের সাথে মহিলা ও শিশুদের ঝোপঝাড়ে বসিয়ে দেই। আমি আরও দ্রুত সামনে এগিয়ে যাই এবং খুব জোরে আর্তচিৎকার দিতে থাকি– বাঁচান, বাঁচান আমাদের বাঁচান। চিৎকার দিতে দিতে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে রাস্তার পাশের একটি দোকানে এবং কাছাকাছি বাড়িঘর আছে এমন জায়গায় ছুটে আসি। আমাদের আর্তচিৎকারে মানুষজন রাস্তায় বেরিয়ে আসে। পিছনে পিছনে আমাদের দলের সক্ষম পুরুষ সদস্যরাও একত্রে উপস্থিত হতে পেরেছি। জনমানুষের উপস্থিতির কারণে আমাদের পিছনে ছুটে আসা দুর্বৃত্তরা তাদের মিশন অর্ধ সমাপ্ত রেখে চলে যায়। কিন্তু তারা ইতোমধ্যে আধো আলো আধো অন্ধকারে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আমার সাথী বড় ভাইকে একটা কোপ মারে। বড় ভাই রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলে সেই কোপ লাগে হাতের আঙুলে। এতে আঙ্গুলে জখম হয় এবং অর্ধেক আঙ্গুল সামান্য লেগে থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ কাকুর পিছন দিক থেকে ডান কাঁধে ধারাল অস্ত্রের কোপ লাগে। কিন্তু নাগালের বাইরে থাকায় কোপ পিছলে পিঠে লাগে। এতে অন্তত অর্ধেক ইঞ্চি গভীর গর্ত হয়ে লম্বায় চার ইঞ্চির মতো কেটে যায়। তাঁর হাত

থেকে টর্চ লাইটটা কেড়ে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। টর্চ লাইটের ব্যাটারিকে বেষ্টন করে কিছু টাকা ছিল ভিতরে। ঐ টাকাগুলোও খোয়া যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা সবাই হতবিহ্বল হয়ে পড়ি।

তখন মধ্যরাত। পশ্চিম আকাশে চাঁদ হেলে পড়েছে। আমাদের ঘিরে অনেক কৌতূহলী লোক সেখানে ভিড় জমায়। তবে আমরা এখন যেখানে উপস্থিত হয়েছি, সেটা আমাদের বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে। কাছেই একটি প্রাচীন মাদ্রাসা রয়েছে। ঐ মাদ্রাসায় কাকু এক সময় শিক্ষকতা করতেন। তাই ভিড়ের মধ্যে এত গভীর রাতেও কাকুকে কেউ কেউ চিনতে পেরেছিলেন, কাকুও সমাগত লোকদের কাউকে কাউকে চিনতে পেরেছিলেন। আমরা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত ও আহত হওয়ার কারণে তারা সমভাবে ব্যথিত ও আমাদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় এবং আমরা কাকুর পূর্ব পরিচিত নিকটস্থ একটা বাড়িতে আশ্রয় নেই।

আমরা আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রার সমাপ্তি টেনে ভোররাত পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করি। দিনের আলো ফুটে উঠতে উঠতে আমরা আবার আমাদের নিজ বাড়িতে ফিরে আসি। সকালে স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার গোপনে ডেকে আনা হয়। আমার বড় ভাইয়ের কাটা আঙ্গুল জোড়া দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। থানার বড় ডাক্তার আনা বা পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই হাতুড়ে ডাক্তারই ভরসা। ডাক্তার বাঁশের চটি দিয়ে আঙ্গুল বেঁধে কাপড় খণ্ড পেঁচিয়ে দেয়। ব্যথা কমার ঔষধ এবং ইঞ্জেকশন দেয়। আঙ্গুলে যখন ব্যান্ডেজ করা হচ্ছে তখন নড়াচড়ায় প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় ও প্রচণ্ড ব্যথা হয়। অসহনীয় ব্যথার কারণে ভাইটি আমার চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে অ্যানেসথেসিয়া ব্যবহার করার মতো চিকিৎসা আমাদের মতো অজপাড়াগাঁয়ে একেবারেই সম্ভব ছিল না। ভাইয়ের এ আহাজারি, চিৎকার জীবনে কখনো ভুলবার নয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভাইয়ের আঙ্গুলগুলোও জোড়া লেগেছে। কিন্তু আঙ্গুলগুলো মুঠো করে বাঁকানো যায় না। সব সময় সোজা থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় নানাবিধ আক্রমণের এমন ক্ষত অনেকেই বয়ে চলেছেন। আর যারা হারিয়ে গেছেন চিরতরে, তাঁদের আমরা ইতোমধ্যেই ভুলতে বসেছি। লাখো শহীদের ভীড়ে ব্যক্তি বিশেষের ন্যায্যতা আজ জাতীয়ভাবে উপেক্ষিত, অবহেলিত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি বাঙালির জীবনে প্রতিটি রাতই ছিল এমনি বিভীষিকাময়।

গেরিলা

ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হক
প্রাক্তন মেডিক্যাল অফিসার
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

প্রিয় মছির ভাই,
আমরা তোমাকে ভুলি নাই।
মনে পড়ে তোমার গোলগাল চেহারাখানি,
পরনে লুঙ্গি গায়ে হাফ শার্টখানি।

স্কুলে পড়াকালীন তোমার আবৃত্তি–
"দেখ, হতে পারতাম একটা মস্ত বড় বীর,
কিন্তু গোলাগুলি দেখলেই মাথাটা থাকে না স্থির।"
সত্যিই তুমি চির স্মরণীয় মস্ত বড় বীর।

তুমি ছিলে আমাদের রাইডার,
এ কথা জেনেছিল নরপশু পাক হানাদার।

মান্দাইনে (পত্নিতলা থানা, নওগাঁ জেলা) গোলাগুলির পরে,
পাক হানাদারেরা তোমাকে নিয়ে গেল ধরে।
শুনেছি তোমার উপর তারা করেছে অকথ্য অত্যাচার,
যুদ্ধ শেষে আমরা তোমাকে খুঁজে পেলাম না আর।

শেষে আল্লাহর কাছে করি প্রার্থনা,
জান্নাতুল ফেরদৌস হয় যেন তোমার ঠিকানা।

বর্ষায় আমিয়াখুম

শাহরিনা কবির এশা
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড

বর্ষায় বান্দরবান নামক সুন্দরী রমণী কী রূপ
এবং সাজে সজ্জিত হয় তা অবলোকন
করতেই ২৯ জুন রাতে ঢাকা ছাড়ি
আমরা ছয়জন বন্ধু-বান্ধবী।
তখনো জানি না যে পথে
চলেছি তা কতটা কষ্টের
এবং সেই সাথে যে রূপ
দর্শন আমাদের হবে তা
সারাজীবনে বোধ হয়
আর ভুলতে পারব না।
হ্যা, যারা এই বর্ষায়
বান্দরবান ভ্রমণের
কথা চিন্তা করছেন
তারা আগে থেকেই
জেনে নিন, সীমাহীন

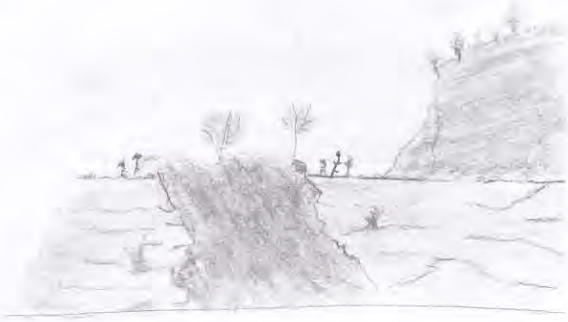

কষ্ট করতে হবে আমিয়াখুম দেখতে হলে। সেই সাথে এটাও বলে দেই, নিরাশ হবেন না কোনো দিক দিয়েই, কারণ কথায় আছে– সবুরে মেওয়া ফলে। তাই ভয়ে গুটিয়ে না থেকে চলে যান মেওয়া খুঁজতে আমাদের মতোই।

হানিফ বাসে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে ভোর সাড়ে ৩টায় পৌঁছে যাই বান্দরবান। যেহেতু বেশ আগে পৌঁছে গেছি অগত্যা বসে সময় কাটানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভোর ৫টা নাগাদ এদিক ওদিক পায়চারী করে ৬টায় চান্দের গাড়ি ঠিক করে রওনা হই থানচির উদ্দেশে। যেহেতু আমরা পদ্মঝিরি হয়ে থুইসাপাড়া যাব, তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় থানচি পৌঁছানো দরকার ছিল বিধায় চান্দের গাড়িতে যাওয়া। খরচ কমাতে আপনারা লোকাল বাসেও যেতে পারেন, তাতে সময় বেশি লাগবে। বান্দরবান থেকে থানচির রাস্তাটা যে বর্ষায় এত সুন্দর রকমের সবুজ আর মেঘে ঢাকা থাকে তা আমাদের জানা ছিল না। এই রূপ দেখতে হলে চান্দের গাড়ি নামক জিপই বেস্ট। মাঝে মাঝে এই রাস্তাকে দার্জিলিং এর কোনো হাইওয়ে ভেবে বিভ্রান্তি যে হয়নি তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। কখনো মেঘ ছুঁয়ে, কখনো মেঘের মধ্যে হারিয়ে বা কখনো আশেপাশের উঁচু নিচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে

সাদা কালো আর নীল মেঘের মিলন দেখতে দেখতে কখন যে থানচি পৌঁছে গেছি নিজেরাও বুঝিনি। ঘড়িতে সময় তখন সকাল ১০টা।

থানচিতে গাইড খুঁজতে, সকালের নাস্তা সারতে, থানা পুলিশের কাজ শেষ করতে এবং সবশেষে নৌকা ঠিক করতে করতে বেজে যায় ১২টা। যেহেতু সামনে ছয় থেকে আট ঘণ্টার একটা বড় হেঁটে যাওয়ার রাস্তা আছে তাই চেষ্টা করবেন যাতে আরো তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায়। ১২টায় নৌকায় করে রওনা হই আমরা পদ্মঝিরির উদ্দেশে। ততক্ষণে আকাশের কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যেহেতু বর্ষাকাল তাই আমাদের সকল ধরনের ওয়েদার এ্যাপ কে কাঁচকলা দেখিয়ে এই বৃষ্টির শুরু হওয়াটা প্রথমে একটু ভয়ই পাইয়ে দেয়, কারণ বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী একটাই এবং তা হলো এই সাংগু নদী। আমাদের প্রথম বান্দরবান ভ্রমণ ছিল ২০১৪ সালের নভেম্বরে, তখনি যে রূপ দেখেছি এই নদীর আর এখন তো ঘন বর্ষা আর সাথে বৃষ্টি। যাইহোক, মনে ভয় নিয়েই যাত্রা শুরু করে দেই।

অবশেষে উত্তাল ঢেউ পার করেই বেশ ভালোভাবে পদ্মঝিরি পৌঁছে যাই আমরা। এবার ব্যাগ কাঁধে চলা শুরু, গন্তব্য থুইসাপাড়া। আমাদের গ্রুপে আমরা ২জন মেয়ে আর বাকি ৪জন ছেলে আর আমাদের পথ প্রদর্শক গাইড অং। ট্রেনিংয়ের সব ধরনের প্রস্তুতি শেষে শুরু হয় আমাদের হন্ঠন যাত্রা। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে কখনো ঝিরি পথ, কখনো লাল এঁটেল মাটির আঠালো কাদা, জোঁকের অবাধ বিচরণ, ছোট-বড়, উঁচু-নিচু আর খাড়া পাহাড় পার করে হরিচন্দ্রপাড়ায় যখন পৌঁছাই তখন শরীরে আর এক ফোঁটাও শক্তি অবশিষ্ট নেই। এর মাঝে যে কতবার পিছলে পড়েছি, কতবার পাহাড়ের উপরে উঠতে আর নিচে নামতে ঘন নিঃশ্বাস ফেলেছি আর বিপদের আশংকায় যে কতবার আল্লাহর নাম নিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। তবে কত নাম না জানা ঝরনা, ছোট মাঝারি জলপ্রপাত আর আশেপাশের অপরূপ পাহাড়ি সৌন্দর্য আরো একটু বেশি সময় নিয়ে দেখার মতো সময় আমাদের হাতে ছিল না বিধায় যে দুঃখের অন্ত ছিল না আমাদের কারো মনে, তা বলা যাবে না। পাহাড়ি সরু পথে ঝিঁঝিঁর ডাক, হঠাৎ সুনসান নীরবতার মাঝে কোনো প্রপাত বা ঝরনার গর্জন শোনার অনুভূতি লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। এই মনোমুগ্ধকর অপরূপ রূপ কেবল ঐ পরিবেশে উপলব্ধি করা সম্ভব। তখন আনুমানিক বিকাল তিনটা। হরিচন্দ্রপাড়ায় বিশ্রামের ফাঁকে গাইড অং কে জিজ্ঞেস করলাম– আর কতদূর? অং এর সোজাসাপটা উত্তর আমার পিলে চমকে দিলো! আমরা কেবলমাত্র অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছি! ২টি খাড়া পাহাড় এবং যদি আমরা দ্রুত না হাঁটি তাহলে সন্ধ্যা হয়ে যাবে নিশ্চিত। যে পথ দিনে দুপুরে পাড়ি দিতে আমাদের এই অবস্থা তা রাতের আঁধারে কীভাবে পার করব তার চিন্তা না করাই শ্রেয় ভেবে সবাই স্যালাইন আর কলা বিস্কুট দিয়ে হাল্কা নাস্তা সেরে উঠে পড়ি তাড়াতাড়ি। যারা এমন পাহাড় ট্রেকিং এ আসবেন তারা অবশ্যই সাথে বেশি পরিমাণ খাবার স্যালাইন নিয়ে

আসবেন এবং পানির বোতল অবশ্যই সাথে রাখবেন। রাস্তায় অনেক জলপ্রপাত বা ঝরনা পাবেন যার পানি খাওয়ার উপযোগী, তাই বোতলে পানি না নিলেও বোতল রাখা অতি জরুরি। আবারো সেই পাহাড়ে বেয়ে উঠা বা খাড়াভাবে নামার মাঝেই রাস্তা চলে যাচ্ছে। আমাদের সাথে আরো একটি গ্রুপ যাচ্ছে যারা আমাদের গ্রুপের ২জন মেয়েকে দেখে রীতিমতো অবাক এবং সেইসাথে সময় বিশেষে অনেক বাহবা দিয়েছে, কারণ ছেলে হয়ে তারা যে কষ্ট আর শক্তি নিয়ে পথ পাড়ি দিচ্ছে আমরাও তার চেয়ে কম যাই না! যাহোক, নিদারুণ কষ্টের অবসান ঘটিয়ে যখন থুইসাপাড়ার একটা টিনের চাল চোখে পড়ল তখন সূর্য তার শেষ আলোটুকু বিলিয়ে লম্বা সময় বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত। আমরা ঠিক সন্ধ্যে নামার মুখে গন্তব্যে সহি-সালামতে আসতে পেরেছি। সময় তখন ৬:৪৫ মিনিট। আমাদের লেগেছে প্রায় ৭ঘণ্টা। হাত-পা, সারা শরীর পরিশ্রমে ক্লান্ত, বৃষ্টি-ঘাম মিলে ভিজে চুপচুপ এবং কাদায় মাখামাখি। চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলাম একটা পাহাড়ের উপর গোটা দশেক বাড়ি নিয়ে গড়ে ওঠা ছিমছাম গ্রাম থুইসাপাড়ার দিকে। কত শান্তি আর অপার সৌন্দর্য বেয়ে পড়ছে গ্রামের আশেপাশের পাহাড়ে তা দেখে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না আমরা কেউ। মেঘ যেন সূর্যের মতো সকাল সন্ধ্যা দেখা দেয় গ্রামের পাশে, মাথার ঠিক উপরেই বা হাতের নাগালে। যাহোক, দ্রুত রাত্রি যাপনের ঠিকানা খুঁজে সেদিনের মতো শরীরকে বিশ্রামে ডুবিয়ে দিলাম। থুইসাপাড়ার কোনো বাড়িতে জায়গা না থাকায় একজন পাহাড়ি তার নিজের বাড়িতে আমাদের থাকার জায়গা দেন। আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ তার কাছে। যেহেতু ঈদের ছুটিতে গিয়েছি আমরা তাই মোটামুটি অনেকগুলি গ্রুপ এসেছে আমাদের মতো, কিন্তু কোনো গ্রুপেই মেয়ে ছিল না আমাদের গ্রুপ ছাড়া। সবাই আমাদের দেখে সপ্তম আশ্চর্য দেখার মতোই অবাক। যেখানে ছেলেরা ঐ পথ পাড়ি দিতে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছে এবং কোনো কোনো দল ১২-১৩ ঘণ্টা লাগিয়ে বা কেউ কেউ হরিচন্দ্রপাড়ায় একরাতের বিরতি দিয়ে তারপর এখানে এসেছে, সেখানে আমরা মেয়ে হয়ে কীভাবে এত তাড়াতাড়ি আসলাম। আমি বলব আমাদের দু'জনের অপরিসীম ইচ্ছাশক্তি, কঠোর মনোবল– পারতেই হবে, আমাদের দলের বাকি বন্ধুদের আমাদের প্রতি শেষ না হওয়া সাহায্য আর বিশ্বাস এবং সবশেষে মহান আল্লাহর মেহেরবানি। এসব ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব হতো না সেই বিশাল এবং কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে সুস্থভাবে পৌঁছানো।

সে রাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম শেষে অনেক সকালে ঘুম ভেঙে গেলেও ভোররাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি আবারো ভয় লাগাতে শুরু করল, কারণ আজ আমাদের ভয়ঙ্কর খাড়া পাহাড় খ্যাত দেবতার পাহাড় ডিঙিয়ে আমিয়াখুম যাওয়ার কথা। কিন্তু বাইরের বেসামাল বৃষ্টি কতটুকু হতে দিবে তা বুঝতে পারছিলাম না। একেতো পাহাড়ি পথ, খাড়া পাহাড়, তারমধ্যে যাওয়ার পথে যদি কাদা থাকে তাহলে কীভাবে কী করব চিন্তায় ৭টা বেজে গেল। নাস্তা সেরে, টুকটাক প্রস্তুতি নিয়ে একটু দেরি করেই যাত্রা শুরু হলো দেবতার পাহাড়ের দিকে। ততক্ষণে বৃষ্টি কমে গেছে এবং আকাশে মিষ্টি রোদ দেখা যাচ্ছে। গাইড অং এর নেতৃত্বে

আবারো শুরু হলো যাত্রা, লক্ষ্য আমিয়াখুম। বেশ সমতল ২টা পাহাড় ডিঙিয়ে যখন দেবতার পাহাড়ে ওঠা শুরু করলাম আমরা তখন বুঝতে পারিনি এটাই দেবতার পাহাড়। পাহাড়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে কোনোভাবেই নামার কোনো রাস্তা দেখতে পেলাম না। নিচে দেখলাম ২০০ ফুট গভীর জলপ্রপাত, তখন বুঝলাম আমরা দেবতার পাহাড়ে। কিন্তু নিচে নামব কীভাবে! বৃষ্টিতে ভিজে পাহাড় এত স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে যে, কোন রাস্তায় কীভাবে নিচে নামব বা আদৌ নামতে পারব কিনা চিন্তা করতে করতে আমাদের ৫-১০ মিনিট সময় লেগে গেল। তারপর কোনোমতে আছড়ে-পাছড়ে হাঁটু গেড়ে সরীসৃপের মতো চেষ্টা করে অবশেষে নামতে সক্ষম হলাম প্রায় ৯০ ডিগ্রি খাড়া দেবতার পাহাড় থেকে। যারা শীতকালে এখানে গিয়েছেন তারা জানেন এটা পার হওয়া কতটা কষ্টকর সেখানে আমরা বৃষ্টির মধ্যে এটা পার হয়েছি। আমাদের সাথে যাওয়া দুই গ্রুপ আমাদের দুইজন মেয়েকে রীতিমতো হাতে তালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে আমাদের এই অপরিসীম সাহসের পরিচয় দেয়ায়। আমরা যে আমিয়াখুম দেখেছি তা শীতকালের আমিয়াখুমের সাথে তুলনা চলে না! এ এক ভয়ঙ্কর রকম সুন্দর। ভাবা যায় না এত সুন্দর জায়গা বা জলপ্রপাত আমাদের বাংলাদেশে আছে! সত্যি এমন সুন্দর কিছু দেখছি আমার নিজের চোখে!! চারপাশে সবুজে ঘেরা পাহাড়, তার মাঝে আপন মনে বয়ে চলেছে আমিয়াখুম নামধারী তেজস্বিনী জলপ্রপাত, যার নিরন্তর ঝর ঝর শব্দ আমাদের যেন সম্মোহন করে নিয়ে চলেছে অন্য কোনো এক স্বপ্নের দেশে। প্রপাতের ঝিরিঝিরি ঠান্ডা পানিতে জুড়িয়ে যাচ্ছে দেহ মন-প্রাণ আর দুই ঘণ্টার অক্লান্ত পরিশ্রম। মনের ক্ষুধা নামক জিনিসটা আসলে কী, সেদিনই বুঝতে পারলাম! যা মিটে গিয়েছিল সবদিক দিয়ে। আমিয়াখুমের তুলনা যেন আমিয়াখুমই। ছবিতে দেখা আমিয়াখুম আর চোখে দেখা আমিয়াখুমে অনেক তফাৎ। ঘন জঙ্গল, উঁচু-নিচু পাহাড়ের মাঝে এমন সুন্দর সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহেরবানী আমাদের উপর। আমাদের জীবন কিছুটা হলেও সার্থক হয়েছিল সেদিন এই সুন্দর সৃষ্টিকে চোখে দেখতে পেরে। বর্ষায় আমিয়াখুমের ভরা যৌবন তখন। তাই আপার স্ট্রিম আর ডাউন স্ট্রিম দুইটাই পানিতে টইটুম্বুর। আমরা ডাউন স্ট্রিমে নামার সাহস করলাম না, কারণ পানির স্রোত এতই বেশি যে ভেসে যেতে দুই মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। আপার স্ট্রিমে বসে আমিয়াখুম মুগ্ধ নয়নে দেখে চললাম সবাই। এই স্ট্রিমের ২-৩টা ধাপ, যেকোনো ধাপেই খুব সহজেই বসে থাকা যায়, কিন্তু তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে আমরা যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। এমন দৃশ্য শুধু কবি-সাহিত্যিকরা তাদের চিন্তাধারাতেই দেখে থাকেন যা আমরা দুই চোখে দেখছিলাম। পাহাড়ের নিচে অবিরাম বয়ে চলা জলপ্রপাত, দুই-তিন ধাপে বয়ে চলেছে তার পানি অজানার উদ্দেশে, ছোট-বড় পাথরে ভরপুর নিচের খুমগুলো– কীভাবে এই সৌন্দর্যের বর্ণনা করা যায়, ভাষা খুঁজে পাওয়াটা সত্যি কঠিন। আমাদের এবারের মূল আকর্ষণই ছিল আমিয়াখুম। এত সফলভাবে আমরা তাকে এইভাবে পাব কারোরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাইতো কখন যে খুমের মাঝে আমরা দুই ঘন্টা পার করে ফেললাম বুঝতেই পারিনি। যখন সম্বিত ফিরল তখন মনে পড়ল এখন ফিরে যেতে হবে। মনে আমিয়াখুমের অপার

সৌন্দর্যের স্মৃতি নিয়ে ফিরে চললাম থুইসাপাড়ার উদ্দেশে।

এ রাতও থুইসাপাড়ায় কাটালাম আমরা নির্বিঘ্নে। সকালে আমাদের গন্তব্য জিন্না পাড়ার ভিতর দিয়ে নাফাখুম এবং সেখান থেকে রেমাক্রি পৌঁছে নৌকায় করে দুপুর দেড়টার মধ্যে থানচি পৌঁছানো। সকাল ৬টায় যাত্রা শুরু করে দেই আমরা। কপাল ভালোই বলব কারণ রাতে অল্প বিস্তর বৃষ্টি হলেও ভোরে কোনো বৃষ্টি ছিল না বলে আমরা ভালোভাবে যাত্রা শুরু করতে পেরেছিলাম। এবারের পথ থুইসাপাড়ার পথের মতো এত দুর্গম ভয়ংকর না বরঞ্চ সুন্দর সবুজে ঢাকা, পাথরে ভরপুর এবং ঝিরিপথে সাজানো। আমরা নদী পার হলাম, মাঠ পার হলাম, উঁচু নিচু অসংখ্য পাথর পার করলাম যা আমাদের হাঁটার গতি একটু কমিয়ে দিয়েছিল, কারণ পাথর বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল ছিল, যদি সাবধানে ঠিক জায়গায় পা না রাখা হয় তাহলে মুখ থুবড়ে মাথাটাই আগে পাথরে পড়বে। তাই সাবধানতার সাথে এগিয়ে যেতে থাকলাম। সত্যি বলতে কি, আশেপাশের সৌন্দর্য এতটাই মনোরম ছিল যে হাঁটতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু একটু বেশি সময় নিয়ে সেই সৌন্দর্য আরো ভালোভাবে দেখার মতো সময় ছিল না আমাদের হাতে। পাথর ডিঙিয়ে, স্রোতের অনুকূলে বুক সমান পানিতে ডুবে ঝিরিপথ পার করে প্রায় সকাল ৯টার দিকে আমরা নাফাখুম পৌঁছাই। প্রথমবার বান্দরবান ভ্রমণে নাফাখুম দেখা হয়েছিল তাই নতুন করে দেখার কিছু নেই, একই রকম সুন্দর পানিবেষ্টিত আবদ্ধ নাফাখুম, বাংলাদেশের নায়াগ্রা। এবার দেখলাম সেখানে ২-৩টা বাড়িঘর হয়েছে যা ২০১৪তে ছিল না। ২০ মিনিটের যাত্রা বিরতিতে হাল্কা নাস্তা সেরে, স্যালাইন খেয়ে শুরু করলাম রেমাক্রির পথে যাত্রা। এর মাঝে আবারো সেই বৃষ্টি । ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি যেন আমাদের আরেক সফর সঙ্গী, পিছু ছাড়ে না সহজে, কিন্তু আমরাও দমে যাওয়ার মানুষ না এই বৃষ্টির কাছে। যেহেতু এই পথে তেমন পাহাড় নেই এবং অর্ধেক পথ পাড়ি দেয়া শেষ তাই বেশ ফুরফুরে মেজাজে আমরা বাকিটা পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম। নাফাখুম ছাড়িয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক আসার পরেই হঠাৎ দেখি বন্দুকধারী ৪-৫ জন। একটু চোখ ঘুরাতেই চোখে পড়ে প্রায় ১৫০-৩০০ জন বন্দুকধারী এন্টি-আরাকান সৈন্য নদী পার হচ্ছে। ওদের দেখে আমাদের গাইড অং একটু চুপ হয়ে গেল এবং আমাদের বলল কোনো কথা না বলে সামনে এগিয়ে যেতে। আমরা ওর কথা মতো এগিয়ে যেতে থাকলাম। প্রায় ২০ মিনিট নদীর পাড় ধরে হেঁটে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরে নদীর এমন এক বাঁকে আসলাম আমরা যেখান থেকে নদী পার হয়ে ওপারে যেতে হবে, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। গাইড অং নদীতে নেমে দেখল ওরই প্রায় গলা পানি, তার মানে আমাদের ওদিক থেকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে জায়গাতে নদী পার হওয়ার রাস্তা ছিল সেখানে এন্টি-আরাকান বাহিনী থাকায় আমরা চুপচাপ চলে এসেছি। আমাদের জন্য ২টা পথ বাকি ছিল তখন। অং এর ভাষ্যমতে তা হলো, অপেক্ষা করা যাতে আরাকান বাহিনী একটু সামনে চলে গেলে আমরা ফিরে গিয়ে ওই কম পানির জায়গা দিয়ে নদী পার হব, আর দুই হলো পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে সামনে এগিয়ে যাওয়া। সেখান থেকে নিচে নামার রাস্তা

আদৌ আছে কিনা অং নিজেই জানে না, কারণ ওরা মানে পাহাড়িরাই অই রাস্তা তেমন একটা ব্যবহার করে না। পাঁচ মিনিট অনেক ভেবে আমরা পাহাড় বেয়ে ওঠাকেই বেছে নিলাম দুইটা পথের মধ্যে কারণ আবারো এন্টি-আরাকান বাহিনীর সামনে যাওয়ার মতো সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। যদি কিছু একটা হয়ে যায়, সাথে আমরা দুইটা মেয়ে! ২য় বার চিন্তা না করে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলাম আমরা। এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। আবারো সেই উঁচু নিচু পাহাড় বেয়ে উঠা– পিচ্ছিল এবং অনেকদিনের অব্যবহৃত পরিত্যক্ত এক পাহাড়, যা উতরানো আদৌ সম্ভব কিনা আমাদের জানা নেই। একপাশে পিচ্ছিল শ্যাওলা পড়া উঁচু পাহাড় আরেক পাশে নিচে দেখা যাচ্ছে নাফাখুমের পানির সাথে বয়ে চলা সাঙ্গু। বৃষ্টিতো ছিলই, সাথে যোগ হলো দুর্গম এক পাহাড় পাড়ি দেয়া। আমরা এডভেঞ্চারে এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারিনি এত কঠিন পরীক্ষার মাঝে পড়ে যাব। আল্লাহ এবারো সহায় ছিলেন আমাদের। প্রায় এক ঘণ্টা এই পাহাড় বেয়ে উপরে নিচে উঠে নেমে, কাঁদায় পিছলে, জঙ্গাল আর শ্যাওলা পার করে অবশেষে আমরা নিচের ঝিরিতে নামতে সক্ষম হই। মনে সেই আগের শান্তি আর ফুরফুরে মেজাজ ফিরে আসে। এতক্ষণ যে মানসিক এবং শারীরিক চাপের মধ্যে সময় পার হয়েছে আমাদের তা ভুলতে সামনের এক ছোট ঝরনায় মুখ, হাত, পা ধুয়ে আকণ্ঠ পানি পান করি সবাই। ঝরনার পানি ছিল ঠান্ডা এবং মিষ্টি। এমন ঝরনা বান্দরবানে কতগুলি আছে কেউ গুনে শেষ করতে পারবে না বোধ হয়। পাঁচ মিনিটের যাত্রা বিরতি শেষে আবারো হেঁটে চলি রেমাক্রির উদ্দেশে। ঝিরিপথই বেশি ছিল এবং এই জায়গায় পাথরে শ্যাওলার পরিমাণ অনেক বেশি ছিল বিধায় হাঁটার গতি কমে যায়। তবুও অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে আমাদের ধরে রাখা সঠিক সময়ে আমরা পৌঁছে যাই রেমাক্রি। সেখান থেকে কোনো কথা না বলে উঠে যাই নৌকায়। নৌকায় এই নদী পথ পাড়ি দেয়াটাও ছিল আরেক ইতিহাস। ঢেউয়ের মাঝে দুলতে দুলতে চলতে থাকে আমাদের নৌকা। মনে হচ্ছিল কোনো নদী না, সাগর পাড়ি দিচ্ছি আমরা নৌকায় করে। রাশি রাশি ঢেউ কয়েকবারই আপাদমস্তক ভিজিয়ে দেয় সবাইকে এবং প্রতিবারই মনে হয় এই বুঝি নৌকা ডুবে গেল। কিন্তু না, মাঝির চমৎকার দক্ষতার জন্য ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যেতে থাকি আমরা। কিছুদূর যাওয়ার পর বোনাস হিসেবে পেয়ে গেলাম কুমারী ঝরনা দেখার সৌভাগ্য যা মূলত বর্ষাকালেই নাকি দেখা যায়, অন্য সময়ে দেখা যায় না। খুবই সুন্দর এবং অনেক স্বচ্ছ পানির ধারায় পরিবেষ্টিত কুমারী ঝরনা ক্ষণিকের ক্লান্তি মুছে দিলো। আবারও এক পশলা ভিজে নিলাম সবাই ঝরনার পানিতে, খেয়েও নিলাম একটুখানি। ফিরে এলাম সবাই নৌকায়।

ফিরে যাচ্ছি– যেমন ক্লান্ত আমরা তার চেয়ে বেশি ভারী মন খারাপের পাল্লা। সবারই যেন মন কাঁদে, ফিরে যেতে চায় না শহুরে ব্যস্ততায়। থানচি পৌঁছে গাইডের কল্যাণে এক রেস্ট হাউজে ভেজা জামা-কাপড় চেঞ্জ করে সোজা উঠে পড়ি বান্দরবানের বাসে। চান্দের গাড়ি তথা জিপে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু যে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত আমরা তাতে আবারো ভয়ঙ্কর বাঁকে জিপের দ্রুত থেকে দ্রুততর গতির খেলা দেখার মতো আর সাহস হচ্ছিল না, বরঞ্চ

চুপচাপ বসে কাটিয়ে একটু দেরিতে হলেও বান্দরবানে পৌঁছানোটাই সবার ইচ্ছা, ঢাকার বাস তো সেই রাত ৯টায়। তাই হেলেদুলে সাদাকালো মেঘের মাঝে হাল্কা বৃষ্টির ফোঁটা হাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বান্দরবান পৌঁছে গেলাম সন্ধ্যা ৭টায়। জনজীবনে ফিরে একটুও ভালো লাগছিল না! পাহাড়, মেঘ বারবারই মনে পড়ে যাচ্ছিল সত্যিই! কথাও কম বলছিলাম সেজন্য। রাতের খাবার সেরে উঠে পড়লাম বাসে ঢাকার উদ্দেশে। সকাল ছয়টায় ফকিরাপুলে নামলাম বাস থেকে। রিক্সায় বাসায় যাওয়ার পথে চোখে পড়ল ব্যাগে লেগে থাকা লাল মাটি, কাদা। নিমিষেই চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই পাহাড়, আমাদের হেঁটে চলা থুইসাপাড়া, বৃষ্টিতে ভিজে নাজেহাল আমরা ছয়জন, কাদায় পিছলে পড়া, পাহাড়ে বিছিয়ে থাকা অবিরাম বাংলার সহজ রূপ, দেবতার পাহাড় থেকে চার হাতে পায়ে নেমে যাওয়া, আরো কত কী! নাহ, আবারো যাব কোনো একদিন, সেই পাহাড়ে। আমিয়াখুমে নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করতে, পাহাড়ি বাঁশের রান্না খেতে, মেঘের মাঝে ভেসে ওঠা পাহাড়ে অনন্তকাল তাকিয়ে থাকতে আবারো নিশ্চয়ই ফিরে যাব আমি, আমরা।

খোলা চিঠি

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
ওয়েলফেয়ার অফিসার
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

প্রিয় ব্যাবিলন কথকতা,
বহুদিন পর আবার তোমাকে লিখতে বসা। ক'দিন ধরে মনের ভিতরে কিছু বিষয় ভীষণভাবে নাড়া দিচ্ছে, কীভাবে প্রকাশ করি ভেবে পাচ্ছি না। আসলে বর্তমান যুগে এতসব মিডিয়া মাধ্যম বের হয়েছে, পত্র মিতালিটা একেবারে সেকেলে বলে মনে হয়। তারপরও তোমাকে লিখতে বসলাম। তুমিওতো অনেক আধুনিক হয়েছ– রূপ, গুণ, লাবণ্য একেবারে টইটুম্বুর টসটস করছ। দেখতে দেখতে (একযুগ) বারোতে পা রেখেছ। দ্যাখো, মাইন্ড করো না আবার, কারণ দেশ এত আধুনিক হচ্ছে আর আমি কিনা সেই সেকেলে পত্র মিতালিতে, হা হা হা ...। আসলে আমার এখনো মনে হয়– "আমার নামে একটা হলুদ খাম আসবে, একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে মগ্ন হয়ে পড়ছি, ওহ! মনে হলেই একটা চাঞ্চল্যকর অনুভূতি।" আবার মনের না বলা কথাগুলো বলবার অন্য যে মাধ্যমগুলো প্রচলিত তাতে কেন যেন সাধ মেটে না। জানি না এমন অনুভূতি সবার হয় কিনা। আমার এখনও হয়।

যাহোক, অবশ্য এতসব মাধ্যমগুলো মানুষকে বুঝতে, জানতে এমনকি সচেতন হতেও সাহায্য করছে এটা ঠিক, কিন্তু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। আবু ইসহাক এর সেই "জোঁক" গল্পের মতো সমাজে কিছু "রক্ত চোষা" মানুষ আছে যারা গোপনে রক্ত চুষে নিচ্ছে, যার কারণে এই স্বাধীন দেশটা উন্নয়নশীল, মধ্যম আয়ের ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর তকমা পেলেও দারিদ্র বেশিরভাগ মানুষেরই ঘর ছাড়ছে না। হ্যা, আমি বলতে চাচ্ছি বর্তমান দেশের নিতান্ত অসহায় মানুষের উপার্জনের প্রধানতম মাধ্যম পোশাকশিল্প কারখানা এবং এর শ্রমিকদের কথা। সম্মানিত মালিকগণ এ শিল্প কারখানা টিকিয়ে রাখার জন্য যেমন যুদ্ধ করছেন অপরদিকে দ্রব্যমূল্যের চড়া বাজারদর, গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল আর অসহনীয় বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধিতে তেমনই হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ শ্রমিকরা। অথচ এ শ্রমিকদের হাত ধরেই প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে আর ফুলে ফেঁপে উঠছে কিছু মানুষ।

এই সাধারণ শ্রমিকদের পিছনের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় তারা ছিল নিতান্তই অসহায়। দুইবেলা ঠিকভাবে খেতেও পারেনি। লেখাপড়াতো অনেক দূরের কথা, অভাবের সংসারে বাবা তার সন্তানকে স্নেহ ভালোবাসাটুকুও দিতে পারেনি। মেয়েদের ক্ষেত্রে আছে যৌতুক, স্বামী ও শাশুড়ির অত্যাচার। এ শিল্প কারখানাগুলো যেমন তাদের বাঁচার মাধ্যম হয়েছে, সাথে দেশের দক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ জনশক্তি হিসেবে নিজেকে তৈরি করেছে তাঁরা।

বর্তমানে সরকারি– বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্প কারখানার মালিকগণ জোরালোভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতায় সাড়া দিচ্ছে এবং শ্রমিকরা তাতে উপকৃত হচ্ছে। শ্রমিকরা বেতন যা পায় তাতে তাদের সুখেই দিন যাওয়ার কথা, কিন্তু বর্তমানে ঐ যে চড়া বাজারদর, গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল আর অসহনীয় বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নতো দূরের কথা এমনকি ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতেও চরম বাঁধার সৃষ্টি করছে। মাস শেষ হতে না হতেই বাড়ি ভাড়া আর মুদির দোকানের খাবারের বিল হিসাব করতে করতে তাদের জমার খাতা শূন্য হয়ে পড়ে ।

দ্যাখো বন্ধু, একটু যদি ভেবে দেখি ঐ শ্রমিকটা কিন্তু সে নিজে বা তার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, সে আরো অনেকের রোজগারের মাধ্যমও বটে, কারণ তার সাথে জড়িত মুদির দোকানদার, স্কুল-কলেজ, কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ী, বাড়িওয়ালা, এমনকি তার অফিস গেটের পাশে বসে থাকা লেইছ ফিতা, ঝালমুড়ি, বাদামওয়ালাটার সংসারও। আবার দেখা যায়– বিভিন্ন ব্যাংকিং (বিকাশ, রকেট) মাধ্যমগুলোও বেশ আয় করছে এ শিল্প কারখানার জনশক্তির উপর নির্ভর করে। আসলে ওতপ্রোতভাবে একটা ভালো ভূমিকা রাখছে তারা। সরকার তো একটা নির্দিষ্ট বেতন শ্রমিকদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এক বছর পর % অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির আইনজারি করেছেন, কিন্তু দেশের চড়া বাজারদর, গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল আর অসহনীয় বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি– কী সমাধান এটার? আর কত দিন শ্রমিকরা আশার আলো দেখার পথ শুধু খুঁজেই যাবে, কিন্তু শেষে খুঁজে পাবে না!

এবার যৌক্তিকতার দিক থেকে যদি চিন্তা করি, একটা শ্রমিককে তার মেধা এবং উৎপাদনশীলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বর্ধিত পারিশ্রমিক অর্জন করতে হচ্ছে। এদিকে বিদ্যুৎ কী দিচ্ছে শ্রমিকটাকে, লোডশেডিং আর লো ভোল্টেজের লাইটিং পাওয়ার, মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে কিনা তা বোঝার উপায় নেই। গ্যাস? সারাদিনের ক্লান্তিমাখা শরীরে যখন সে ঘরে ফেরে রান্না করে খেয়ে দেয়ে একটু আরামে ঘুমাবে বলে, তখন গ্যাসের পাওয়ার এতোই নিভু নিভু যে তার ঘরের মোমবাতিটারও বরং ভালো শক্তি আছে। অপেক্ষা, রাত ১২টার পর গ্যাস আসবে, তখন রান্না হবে, তার পর খাওয়া, ঘুম। পরদিন যথাসময়ে অফিসে যেতে হবে– তার টেনশন। টয়লেট, বাথরুম স্বাস্থ্যসম্মত দূরে থাক ঘরে কবে রঙ লাগিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। জরাজীর্ণ ঘরের চাল থেকে মাঝে মাঝে

বৃষ্টির পানিও পড়তে দেখা যায়। এসব কথা শোনার সময় বাড়িওয়ালার নেই, কিন্তু আবার ঘর ভাড়া যথাসময়ে না পেলে বাড়িওয়ালা বাবুদের মাথা ঠিক থাকে না, মুখের উপর যা তা বলে দেয়। সবশেষে হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখা যায়– তাদের বার্ষিক আয় হলো যা তার চেয়ে বেশি খরচ হলো। এখানেই যে শেষ তা নয়, তারা ঘর থেকে বের হয়ে সুস্থভাবে ঘরে ফিরবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই, কারণ বর্তমানে রাস্তার ব্যবস্থাপনা সাধারণ শ্রমিকের জন্য নিরাপদ নয়। প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা লেগেই আছে। তারা যে রাস্তাগুলো ব্যবহার করে তার বেশিরভাগই হাঁটু সমান কাদাপানিতে ডুবে থাকে, অপরিকল্পিত ড্রেন, নালা, নর্দমায় ভরা।

আমার এখানে প্রশ্ন হলো শ্রমিকগণ যখন কোনো ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করছে গেট থেকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে বের হওয়া অবধি, এবং কিছু কারখানা মালিক (ব্যাবিলনের মতো) কিছু সিএসআর কর্মসূচির মাধ্যমে সেই শ্রমিকটা ফ্যাক্টরির বাইরেও যেন নিরাপদ বা একটু ভালো থাকে তার ছোট্ট প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে (যদিও সব মালিকগণ না, এখনও কিছু ফ্যাক্টরির ভিতরে কিছু নরপশু রয়েছে যার কারণে শ্রমিকেরা এখনো শোষিত, নিষ্পেষিত, যা হয়তোবা মালিক পর্যন্ত পৌঁছে না। তারপরও মালিক শ্রমিক এখন অনেক সচেতন। আর হয়তো বেশিদিন ঐ দুষ্ট লোকেরা টিকতে পারবে না) সেখানে কেন সবাই যার যার স্থান থেকে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না? কেন বাড়িওয়ালাদের জন্য আইন জারি হচ্ছে না, কেন লোডশেডিং বন্ধ আর সঠিক মাত্রায় গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে না? কেন? সব কেনর সমাধান হয় না। ওরা যে এই দেশেরই জনশক্তি। ওরাও একটু সুস্থভাবে বাঁচতে চায়।

দুঃখিত, আমি মনে হয় বেশি আবেগাপ্লুত হয়ে গেছি। এত আবেগীদের সবাই ভালোবাসে না। তুমি একটু ব্যতিক্রম তো, তাই বক বক করলাম। এতক্ষণ ধৈর্য্যের সাথে পড়ার জন্য ধন্যবাদ। অনেক অনেক মঙ্গল কামনা করি এবং তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো বিদায়।

ইতি -
তোমার শুভাকাঙ্খী
ইরা

চকি

মোঃ জোবায়দুল ইসলাম
ম্যানেজার, সেলস্ অ্যান্ড মার্কেটিং
ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড

গোলাগুলির শব্দ। পাকবাহিনী আসছে। চারদিকে আতঙ্ক। গোলাগুলির শব্দ শুনলেই যে যার মতো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। মাটিতে শুয়ে পড়ে। পাশের বাড়ির ইউনুস শুয়ে পড়লে আর উঠতে চায় না।

একদিকে যুদ্ধ অন্যদিকে নিজেদের টিকে থাকার লড়াই। বড় পরিবার, তাদের মুখে অন্নের ব্যবস্থা করা। সংসারের বড় ছেলে হিসেবে জহুরুল বাবাকে সাহায্য সহযোগিতা করে। বাবার করুণ মিনতি– তুই যদি যুদ্ধে যাস তাহলে আমাদের কী হবে, কীভাবে আমরা চলব? আমি একা কী করব, কয় মাস হলো বাড়ি-ঘর আগুনে পুড়ে গেল। সংসারে আর কী থাকে! এই সময়ে ব্যবসাপাতিরও যে দুরাবস্থা!

না, যুদ্ধে যাওয়া হয়নি। পরিবারের মুখে খাবার যোগাতে, তাদের বাঁচাতে জহুরুল তার বাবাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করছে। তার বন্ধু, অনেক সহপাঠী সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে।

ভোররাত। জহুরুলের কোম্পানি কমান্ডার বন্ধু এবং একদল মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নেয় জহুরুলের বাড়িতে। অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ তার শোবার চৌকির বিশাল বাক্সে রেখে অবস্থান নেয় তারা। ক্যাম্প গড়ে বাড়ির পাশে ঝোপঝাড়ে পূর্ণ পুরোনো পুকুর পাড়ে।

আগুনে বাড়ি-ঘর সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে চৌকি ঘিরে এ বিরাট বাক্সটি তৈরি করা হয়েছিল। এ বাক্সের সন্ধান বন্ধুদের অনেকে পূর্ব থেকে জানত।

জহুরুল হক তার বাবার সাথে সারাদিন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড করে। সেইসাথে চারপাশের

মুক্তিযুদ্ধ, রাজাকার, পাকিস্তানি বাহিনীর গন্তব্যস্থল, গতিবিধির তথ্য সংগ্রহ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদান ছিল তার দৈনন্দিন কাজ। তিনি গোয়েন্দা। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার একজন বিশ্বস্ত গোয়েন্দা। গভীর রাতে তাদের পথ দেখানো ছিল তার গুরু দায়িত্ব।

জহুরুল যেখানে ব্যবসা করত সেই গ্রাম নারিকেলবাড়ি। উলিপুর থেকে বাবাকে নিয়ে গরুর গাড়িতে ভোরবেলা ছুটে চলত সেই চিলমারি বন্দরে। যুদ্ধকালীন প্রথম বাংলাদেশ সরকার সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করলে ভুরুঙ্গামারি, ফুলবাড়ি, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম সদর ও উলিপুরের কিছু অংশ নিয়ে ৬নং সেক্টর এবং উলিপুর থানার বাকি অংশ, চিলমারি ও রৌমারি ১১নং সেক্টরের অধীনে ভারতের মাইনকার চরে প্রতিষ্ঠিত সাব-সেক্টরের অধীনে পরিচালিত হতো।

যুদ্ধ, ভয়াবহ যুদ্ধ! কী নির্মম নৃশংসতা! উলিপুর ডাকবাংলার পাশে চোখ বেঁধে সারি সারি হত্যা করা হয়েছে। উলিপুরের হাতিয়ায় নিরীহ ঘুমন্ত মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি করে, পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ৬৯৭ জন নারী-পুরুষ-শিশুকে। অবর্ণনীয় নির্মমতা! জেল, গণহত্যা, কুড়িগ্রামে সাওতাল নিধন, আরো আরো কত নির্মমতা!

গভীর রাত, গভীর বনজঙ্গল, দীর্ঘ পথ বেয়ে এগিয়ে চলছে মুক্তিযোদ্ধারা। হঠাৎ চারদিকে গোলাগুলির শব্দ, আর্তচিৎকার।
জয় বাংলা।
ঘুম ভেঙে যায় জহুরুলের। পাশে ছোট ভাই জুলফিকার। ঘুম ভেঙে যায় তারও। ঘুমের ঘোরে ও বলে ওঠে জয় বাংলা। যে বিছানায় দু'ভাই শুয়ে আছে, যে পুরোনো চৌকিতে শুয়ে আছে, এই চৌকির তলদেশ- পুরোটাই একটা বিশাল বাক্স। এই বাক্স মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন। এটি মুক্তিবাহিনীর ব্যবহৃত। এখানে অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা হতো এবং এখান থেকে নিয়েই ব্যবহার করা হতো। এই বিছানায় ঘুমালেই স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বপ্নেরা জমা হয়। এই বিছানায় ঘুমালেই চোখে নতুন স্বপ্ন, নতুন নিশানা ওড়ে।

যুদ্ধ শেষ। মুক্তির সুবাতাস চারদিকে। একদিন কোম্পানি কমান্ডার বাড়িতে আসলো। সাথে কিছু নামবিহীন সনদ ও এক কার্টন অস্ত্র। বলল– জহুরুল, এ অস্ত্রগুলো তোর এ বাক্সে রেখে দে।
আর একটা সনদ হাতে ধরিয়ে দিলো।
– বললাম, যুদ্ধ শেষ। যে মুক্তির জন্য আমরা লড়লাম তাতো পেয়েছি। আর একটিও আগ্নেয়াস্ত্র এ বাক্সে রাখব না। অনুরোধ করছি এগুলো ফেরত নিয়ে যা। আমার এ সনদও লাগবে না।
– রাখ, রাখ বলছি। কেন লাগবে না।
-না বন্ধু লাগবে না। যা করেছি সব তো আমরা এ দেশটার জন্য করেছি।

বাবা হয়তো সেদিন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সনদটি রাখতে পারতেন যদি না কমান্ডার যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো অন্যায়ভাবে না রাখতে বলত। সেসবে বাবার আফসোস নেই। কিন্তু আজ নতুন প্রজন্ম জানে এ সনদের আজ কত মর্যাদা, কত গুরুত্ব। আজ এ সনদ মর্যাদা দিয়েছে– আমরা মুক্তিযোদ্ধা, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান।

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আমরা ভাইবোনেরা ঢাকায়, বাড়িতে ছোটবোন জেবুসহ বাবা মা। স্বাধীনতার অপশক্তি যারা সেদিন বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তাদের ফাঁসির দাবিতে উত্তাল ঢাকার শাহবাগ চত্বর, উত্তাল গণজাগরণ মঞ্চ, উজ্জীবিত প্রতিবাদমুখর আমরা ভাইবোন, পরিবারের সকল সদস্য, উজ্জীবিত এদেশের মানুষ।

দীর্ঘ ২৫/২৬ বছর যে চৌকিতে শুয়ে থাকলাম, শুয়ে থাকলাম পরিবারের সদস্যরা, তার যে নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে তা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম।

হঠাৎ বাবাকে একদিন ফোন দিলাম।
– বাবা, আমার ঘরের চৌকিটা আছে তো?
– নাতো, ওটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। নতুন খাট বসানো হয়েছে।

নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম কিছুক্ষণ। সমস্ত শরীর, কথাবার্তা বরফের মতো জমে যাচ্ছে। এ কী হলো, কেন এটিকে যত্ন করে রাখতে পারলাম না। প্রতিবার ছুটিতে যখন বাড়িতে যাই– বিছানায় বসি, শুয়ে থাকি, নিজেকে গর্বিত ভাবি, নতুন কোনো স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি।

বাবাকে বলি–
– বাবা, চৌকিটির কাঠগুলো কি নাই?
– কোন কাঠ কোথায় গেছে!
জানলাম, রান্নার কাজে পোড়ানো হয়েছে। মনে হলো– বুকের ভিতর যেন সেই ছিন্নভিন্ন কাঠগুলো পুড়ে গেছে। তাকে পোড়ানোর দহন যেন বুকে জ্বলছে।
বাবাকে বললাম–
– একি করলে!

বাবা ততক্ষণে নিরুত্তর। ভাষা বিবর্ণ। সত্যিই তো চৌকিটি পুরোনো কিন্তু কাঠতো এখনো শক্ত। এটিকে রেখে দিলেই পারতাম। একই চৌকিতে আমি ঘুমিয়েছি, আমার সন্তানেরা ঘুমিয়েছে। নতুনত্বের আধুনিকতায় এটি ভেঙে একটি নতুন খাটের কি খুবই প্রয়োজন ছিল! চৌকিটি পুড়িয়ে সবার ভিতরে যে অন্তরজ্বালা তা আজ সবাই বুঝতে পারি।

বোধোদয় হয়– যখন সেই পুরোনো পুকুর খুঁড়তে বের হয়ে আসে জমানো গোলাবারুদের অংশ, পরিত্যক্ত গুলি এবং যেগুলি খেলাচ্ছলে নষ্ট করে যত্রতত্র ছুঁড়ে ফেলি।

কই! কেউ একবারও তো বলেনি এগুলো রেখে দাও!! এগুলো তোমার এবং তোমার পরবর্তী প্রজন্মের স্মৃতিচিহ্ন হবে একদিন।

বাড়িতে ফিরলাম।
নতুন খাটে শুয়ে পুরোনো খাটের আদলে বানাব চৌকিটা। বার বার চোখে ভাসছিল কাঠ খোদাই করে কত সুন্দর কাজ। দু'পাশে দু'টো করে ছোট গোলাকার আয়না বসানো।

রাত গভীর হয়। ঘুম আসে না।
মনে পরিবর্তনের অনেক ঢেউ, অনেক জিজ্ঞাসা, যাপিত জীবনমান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্মুখে অসহায় বন্যার্ত মানুষের কত করুণ ছবি।

সমাজ বদলের নতুন কোনো অঙ্গীকার মাথায় ঘুরপাক খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন যে কোথায় হারিয়ে গেছি। চৌকিটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। কাঠগুলো এখান ওখান থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসছি। কিন্তু মেলাতে পারছি না। কাঠে আগুন জ্বলছে। দু'হাতে থাপড়ে থাপড়ে নিভাতে চেষ্টা করছি। হাতে ফোস্কা পড়ছে। তবুও একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে ধরে রেখেছি। দেখছি, মশাল হয়ে তা জ্বলছে।

মশাল হাতে আমি অন্ধকার পেরুচ্ছি। এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে। চারপাশের আগুনে পোড়ানো লাল কয়লাগুলো দীপশিখা হয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এগুলো আকাশ পেরিয়ে মহাশূন্যের দিকে যাবে। হয়তোবা সাত আসমান পেরুবে!

স্বপ্নকন্যা

মোঃ ফরহাদ হোসেন নির্জন
অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্ডাইজার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আমার–
চমকে উঠি আমি, বলি– দাঁড়াও, যেওনা!
প্রায় রাতেই আমি একটা স্বপ্ন দেখি,
ভারি মধুর সেই স্বপ্ন–
সুনীলের কবিতার মতো একটি কিশোরী
তার করমচা রঙিন হাত নেড়ে আমায় ডাকে।
পিছু ছুটি ওর,
ও আমার সামনে সামনে হাঁটে–
ওর পায়ের নূপুরের বাজনা, কণ্ঠের মিষ্টি গান
কানে এসে বাজে আমার।
মাটি না ছুঁয়েই যেন হাঁটতে পারে ও।

যেতে যেতে অনেক দূর চলে যাই,
হঠাৎ দেখি ভারি সুন্দর একটা জায়গা–
অন্তরীক্ষ জুড়ে তীব্র নির্জনতা
একটা কোনো শান্ত নদীর তীর
চারপাশে বিশাল উঁচু উঁচু পাহাড়
মাঝে সরু রূপালী ফিতার মতো নদী
নির্জনতা ভেঙে বহুদূর থেকে
অস্পষ্ট একটা ঝরনার শব্দ
পাহাড়ি গাছগুলো চাঁদের আলোয় নড়ছে
কোথাও থোকা থোকা জোনাকির আলো
মৃদু বাতাস চারদিকে
সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর অথচ
ভারি সুন্দর একটা জায়গা
যেন রূপকথার দেশ।

হঠাৎ পিছু ডাকি ওকে–
বলি– দাঁড়াও, কে তুমি?
পিছু ফিরে তাকায় ও!

আমি উদাস উদাস চেয়ে থাকি ওর চোখের দিকে
নীলিমার মতো নীল ঐ দু'টি চোখে
যেন পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা লুকানো।

একটু একটু করে ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়
ওর চোখে ভেসে ওঠে আমার প্রতিচ্ছবি।
মৃদু বাতাস– হঠাৎ ভয়ঙ্কর শব্দে জড়িয়ে ধরি ওকে
ও আলতোভাবে ছুঁয়ে দেয় আমায়
ওর গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটে

কী যে ভালোবাসা লুকানো,
ওর ঠোঁট স্পর্শ করার পর অনুভব করি।

বুকের ভিতর একটু একটু কাঁপন লাগে
ওর গায়ের গন্ধে বিভোর হয়ে যাই আমি
বলি তুমি কত সুন্দর!
তুমি বললে আকাশ যখন তখন বৃষ্টি পাঠাবে
বাতাস থেমে যাবে
সূর্য গলে পড়বে তোমার পায়ের কাছে
আমার কথা শুনে ও ঠোঁট চেপে মৃদু হাসে!
ওকে প্রশ্ন করি–
কে তুমি?
ও বলে– তোমার স্বপ্নকন্যা।
তুমি কোথায় থাকো?
তোমার স্বপ্নের রাজ্যে।
তারপর,
তারপর একটু একটু করে কাছে আসা
ওর কোলে মাথা রেখে কল্পলোকের গল্প শোনা
আমি ঘুমিয়ে পড়ি এক সময়
ও আমার হাতে হাত রেখে বলে,
যেতে হবে আমায়, ভোর হয়ে এল।
সব সুখ যেন নিমিষেই হারিয়ে গেল
ও ধীরে ধীরে চলে যায় ঐ দূর নীলিমায়,
আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

তারপর, কাঁদো কাঁদো গলায় বলি–
তুমি যেওনা স্বপ্নকন্যা যেওনা
হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় ও
আমি চিৎকার করে উঠি
বলি, দাঁড়াও, যেওনা–
ঘুম ভেঙে যায় আমার
দেখি শুধুই স্বপ্ন।

স্বপ্ন হারিয়ে বাস্তবকে খুঁজি
কিন্তু কোথায় পাব তাকে?
হয়তো নীল আকাশের নিচে
খুঁজে পাব তাকে!

দূর বহুদূর কোনো প্রান্তে
যার ঠোঁটে থাকবে রহস্যময় হাসি
চোখে তার স্বচ্ছ দীঘির জল
ভাসাময় চোখে ভাষা নেই
দুঃখের সাগর যেথায় টলমল
যে বাস করে অমাবশ্যার অন্ধকারে
কিংবা বাঁধভাঙা চাঁদের জ্যোৎস্নায়
অথবা তীর ভাঙা নদীর তীরে
খুঁজে পাব তাকে।
আকাশ সাগর যেথায় মিশেছে
সীমাহীন দিগন্তের দূর সীমানায়।

হয়তো সকল ক্লান্তি শেষে
কোনো এক সোনালী সকালে
দখিনা মৃদু বাতাসে
কিংবা
পড়ন্ত বিকেলের ক্লান্ত রোদে
একদিন তুমি আসবে।
নয়তোবা খুঁজে নেব তোমায়
জ্যোৎস্নাভরা মায়াবী চাঁদের মাঝে
কিংবা রিমঝিম বর্ষা রাতে
কোনো এক স্বপ্নের দেশে।
হয়তো আপন করে পাব না
তোমায় কোনোদিন–
তবুও তুমিই রবে আমার মাঝে চিরদিন।

Corporate Management-The Japanese Way

Mohammad Hasan
Executive Director
Babylon Group

Japan is an island nation in East Asia. There are 6,852 islands in total. The major islands are - Hokkaidō, Honshū, Shikoku and Kyūshū. Total territory is about 145,916.9 sq miles, of which 144,724 sq miles are land and 1,193 sq miles are water. Out of total land arable land is only 11.65%; about 72% of Japan is mountainous. Japan has a population of 127,103,388 (2014 est.), with a very low growth rate -0.13%. With a high standard of living Japan's position is 20 (2015) in Human Development Index(HDI). The Japanese population has the highest life expectancy - 84.46 years and also the third lowest infant mortality in the world, which is 2.13/1000. Politically it's a constitutional monarchy with a parliamentary government.

Japan has no natural resources like- oil or gas. Japan is the third largest oil consumer in the world after the United States and China. It relies on oil for about half of its energy needs. Besides Japan has to fight against natural calamities almost always.

Japan got involved in World War I (28 July 1914 - 11 Nov 1918) on

the side of the Allied Forces (British Empire, France, Russian Empire, Italy, United States, Japan) against the central powers (Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, Ottoman Empire. On the contrary, in the World War II (1939 - 1945) Japan was on the side of Axis Forces (Germany, Italy, Japan) against allies (USA, Russia, UK, France, China).

After the tragic consequences in the world war II Japan followed the strategies applied by the then Prime Minister Yoshida, which is known as Yoshida Doctrine (1946-47 & 1948-54). The major principles of the Yoshida doctrine included - a tight relationship with the United States, creation of the Ministry of International Trade and Industry (MITI) with a mission to promote economic growth through close cooperation between the government and big businesses, apply technology and quality control techniques of the west, restrictions on labor unionization, long working hours etc.

Corporate Management

The term corporate management relates to how firms are owned, managed and controlled. Corporate Management separates ownership from its operational control.

In the era of Globalization, open market competition, an independent corporation is operated by a non-owner like CEO under passive BODs.

The real owners of great corporations, in America are millions of middle-class shareholders.

But in many parts of the world a handful of immensely wealthy families control almost all of a country's large corporations where professional managers are hired to help family dynasties.

Corporation

A corporation is a business organization formed by a group of people, and it has rights and liabilities separate from those of the individuals involved. It may be a nonprofit organization engaged in activities for the public good; a city corporation or a private corporation, which has been organized to make a profit.

❑ Legal existence

Firm that meets certain legal requirements to be recognized as having a legal existence. In the eyes of the law, a corporation has many of the same rights and responsibilities same as a person. It may buy, sell, and own property; enter into leases and contracts; and bring lawsuits. It pays taxes. It can do good and be rewarded, and can commit offence and be punished (often with fines) if it violates the law.

❑ Limited Liability

A firm and its owners are limited in their liability to the creditors and other obligors only up to the resources of the firm, unless the owners give personal-guaranties.

If you own shares in a corporation that cannot pay its debts and is sued by its creditors, the assets of the company may be seized and sold. But although you can lose your investment, the creditors cannot attach your personal assets (such as cars, houses, or bank accounts) to satisfy their claims.

❑ Continuity of existence

A firm can live beyond the life spans and capacity of its owners, because its ownership can be transferred through a sale or gift of shares.

Unlike corporations, partnerships and sole proprietorships do not provide limited personal liability for business debts. This means that

creditors of those businesses can go after the owners' personal assets to collect what's due. Organizing and operating a partnership or sole proprietorship is much easier than forming a corporation, because no formal paperwork is required.

Three sacred treasures of Japanese Management

There are three major elements in Japanese corporations- lifetime employment, seniority and enterprise union.

Lifetime Employment

Lifetime employment refers to the practice of allowing workers to remain with the company throughout their work life. Lifetime employment in Japan was widespread throughout most organizations, in particular, large companies. The lifetime employment agreement was unwritten and there was no written contract guaranteeing that the individual could stay with that company until retirement. Not all workers received lifetime employment. It was limited to male university and high school graduates in large companies, meaning that roughly 30 percent of the workforce had lifetime employment. Recruitment was thus an exchange of commitment: the recruit agreed to join the company and the company assumed the obligation of looking after him for as long as possible. After joining the company, recruits spent a number of months receiving general training. During this time the emphasis was not on learning specific skills but rather on learning about the company and the way to work and behave in the company. These new workers would then be placed in a section of the company without being given any choice, and spent the next few years learning from senior workers in that section. Every three to five years, workers were transferred to different sections which were often located in different parts of the country.

These transfers tended to be of a general nature with workers

moving across functions, such as from marketing to accounting, rather than staying in one particular functional area. Employees were given little choice with regard to transfers and it was clear that transfer decisions were based on company needs. These recruitment, training and transfer practices relied on a tradeoff between job security and loyalty. This implicit understanding between workers and companies in Japan remains as one of the key underlying principles of business management.

Seniority

Seniority refers to a system in which promotion and wages were determined based on the number of years in the company. It was assumed that length of service was correlated with increased experience and accumulated knowledge. Promotion and wages were actually based on a combination of length of service and merit, with seniority carrying greater weight. The first promotion often did not take place until a worker was in his 30s. Early in their careers, workers rose through the company at about the same pace as members of their peers.

Enterprise Unions

Japanese enterprise unions had a number of characteristics different from unions in other countries. First, enterprise unions were single company unions, as opposed to trade unions, which the employee belonged to. There was no differentiation based on occupation or job category. Second, these unions where comprised of full-time company employees, both blue-and white-collar workers who were below the level of section chief. Part-time workers, upper-middle managers and higher were not part of the union. Third, these unions had a dual relationship with management. These unions were more cooperative than confrontational with management.

Over the last decade, Japanese companies have been forced to

change their management system. By the 1990s, this management system was seen as ineffective or dysfunctional. Some of the factors like declining in sales and profits forced companies to make changes, to their management system including decrease in salaries, reduced overtime pay, voluntary early retirement, increase in non-regular workers: hired more part-time or contract employees, moving their production facilities abroad. Most companies have shifted away from seniority and have focused more on merit when making wage and promotion decisions.
Over the past few years, the role of unions in Japan has been declining.

In Japan Job is treated something very honorable. A man as a professional do the things, that's why people in Japan do not mind working in company late hours, if needed. Man moves to make other happy. Work is the center of life.

How To Be A Good Boss

Liakat Hossain Nayan
Chief Executive Officer
Newgen Technology Limited
Babylon Resources Limited

Now- a- days in any modern competitive industry it is very much essential to have a good boss to run the organization effectively. Due to absence of a good boss an organization and its employees can suffer a lot. To become a good boss it is not easy but also not impossible.

A person needs to have a number of qualities. Here I discuss 7 top qualities of a good boss.

1. Love and value your colleagues:

Whenever I discuss with someone about virtue of a good boss, I start with this-

Love your colleagues, respect them, value them and do it with your heart. If you are the owner of a company, consider your employees your partners. You should strongly believe that they are the people who are working to achieve your vision. Sun Tzu, the writer of the book "The Art of War" said that, "Look upon (your soldiers) as your own beloved sons, and they will stand by you even unto death."

2. Make a good Connection with your colleagues:

"Everyone communicates - few connect" - one of my favorite quotes from John C. Maxwell's Book.

Connection establishes when a person trusts you. When a person will believe that they are regarded as a valuable asset for the organization. If you can make them believe that they will also be benefitted from the work they always do for the organization and you are the person who will look after them not only in your good days but also support them in their rainy days then, I believe, they

will work for you from their heart. So, try to learn the technic of connecting with others.

3. Delegate authorities:

If you want to build a large corporation or are going to lead a large group of people, then you should know how to delegate authorities. You should distribute the task to your subordinates for better management. But you have to choose the right people and establish an accountability process. Some people are always afraid of delegating the work to other people. I have found two big reasons behind this - (1) They feel insecure about their own positions, (2) They don't have enough faith in their colleagues. So, if any of the above mentioned weaknesses is found within you, you should work on the area you are afraid about and try to build strong personal relationship with your colleagues.

4. Conflict minimizer:

"The workplace can become a toxic environment when leaders allow conflict to fester rather than confront it head-on"- I read that quoted line at Forbes Leadership article. There is an old belief "divide and rule". Now a days in this modern business era this policy is not feasible. For the betterment of the organization, you have to pay close attention to the conflict throughout the organization. Try to resolve conflict as much as possible. Remember, when you are in the middle of a discussion, keep your emotion in check, act wise, without any valid reason you should not support any specific party. Your decision must convince both the parties that it is good for them as well as for the organization.

5. Pay attention, listen carefully:

A Leader must carefully listen to each and every one. If you pay a close attention to what your colleagues say, then two things happen - (1) you will understand what he actually wants to express. (2) Your colleagues feel empowered and comfortable to work with you. In

my whole career, I experienced that many of the superiors don't even want to listen to their juniors; they have a predetermined mindset that they know better than them. If you see the good bosses within your organisation then you will find that they listen to each and everyone carefully. You have to pay attention to your listening skill for 5-6 weeks, which will help you to be a good listener to achieve one of the major qualities of a good boss.

6. Self-evaluation:

If you want to be a good boss, self- evaluation is very essential. If you think you are the boss and no one is observing your work, then you are wrong! Your colleagues are always observing you. You love those colleagues who maintain the regularity, who are hard workers, team players, good communicators, trustworthy people, who finish the work on time. So, you have to be your own boss. Every day, you should keep 10 minutes to evaluate your own work.

7. Honesty:

One day during a discussion with my boss Mr. Emdadul Islam, one of the Directors of Babylon Group, he told me, "if you have all virtues but you are not honest then you will fail to become a good boss." Honesty is the first criterion to be a good boss or a good leader. Otherwise, people won't respect you, listen to you or follow you. Albert Einstein said, "Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters." Honesty is mandatory not only to become a good boss but also to be a good human being.

A person can be a good boss with the combination of multiple qualities. I believe everyone has capabilities to achieve any skills, so work on your shortcomings. Best of Luck!

PHOTO ALBUM

Prof. Dr. Abdur Rob, Ex. Vice Chancellor, Eastern University along with the honourable guests and two Directors of Babylon Group are unwrapping the 11th issue (2016) of Babylon Kathokata.

One of the scholars is receiving his first installment of 'Babylon Scholarship' (2017) from Prof. Dr. AAMS Arefin Siddique, Ex. Vice Chancellor, Dhaka University.

This year (2017) Babylon Garments Limited, Aboni Knit Wear Limited and Babylon Trims Limited have been awarded the 'Safety Certificate' by Alliance for Bangladesh Worker Safety.

One of the executive leadership training sessions in 2016 at Aboni Knit Wear Limited, which ensures the continuous development of the employees of Babylon Group.

Babylon is distributing relief (2017) to the flood affected people in Lalmonirhat district of Bangladesh.

Babylon team distributed warm clothes amongst the children of Pawmang School, Lama, Bandarban in December 2016.

Babylon's banner has been raised at 19599 ft. at Mount Kanamo peak in Himachal Pradesh, India (2017); it was an expedition by Mr. Jaherul Hasan, an Intern of Babylon Group.

Babylon has its own Apparel Design Studio, which has started its journey in 2017 in London, UK.

OUR PRODUCTS AND SERVICES

- ERP Solution
- Hospital Management Solution
- Asset Management Solution
- Document Management Solution
- Sales CRM
- Android GPS Tracking App
- E-learning Portal
- Apps & Games Development

LEARNERS CAFE
YOUR ONLINE SCHOOL

GPS71

NEWGEN
Transforming Technologies for Tomor

8023495-6, 8023462-3

infobrl@babylon-bd.com
sales@newgen-bd.com

www.newgen-bd.com
www.brlbd.com
www.gps71.com
www.learnerscafe.com

BABYLON RESOURC
Building Future Enterp

ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহ-

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড
- অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড
- অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড
- অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড
- জুনিপার এমব্রয়ডারিজ লিমিটেড
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিমিটেড
- ব্যাবিলন আউটফিট লিমিটেড (ট্রেন্ডজ)
- ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড
- ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিকস লিমিটেড
- ব্যাবিলন মেরিন ভেনচারস
- ব্যাবিলন এগ্রিসাইন্স লিমিটেড
- নিউজেন টেকনোলজি লিমিটেড
- ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড
- গ্রামীণ ব্যাবিলন প্রোডাক্টস

Head Office:

2-B/1, Darussalam Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.

Tel : 9023495-6, 8034266, 9023460, 9023462-3, 9015165 (Off)
9010533, 9007175 (Fac)

Fax : 880-2-8032949

E-mail: babylon@babylon-bd.com

Web : www.babylongroup.com